ফাহমুস সালাফ

দীন বোঝার কষ্টিপাথর

ইফতেখার সিফাত

ইসলামি জ্ঞানতত্ত্বে 'ফাহমুস সালাফ' নতুন কোনো বিষয় নয়। এর গুরুত্ব ও প্রায়োগিক কাঠামো উম্মাহর আলিমদের কাছে সবসময়ই পরিচিত ছিল। নিজেদের লেখায় বারবার তারা এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু আধুনিক সংস্কারবাদী চিন্তাধারার লোকজন আজকাল এই বিষয়টিকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে বেশ মরিয়া। কারণ, ধর্মীয় ব্যাখ্যার নিজস্ব মনগড়া চিন্তাধারা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে ফাহমুস সালাফ তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ফাহমুস সালাফ-সংক্রান্ত নানা সংশয় ও সন্দেহ নিরসন জরুরি ছিল। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তরুণ আলেম মাওলানা ইফতেখার সিফাত এই কাজটিই করেছেন। আমাদের এই তরুণ বন্ধু তার লেখাজোখার মাধ্যমে মুসলিম-সমাজে ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় চিন্তার বিকৃতি সম্পর্কে সতর্ক করার কাজটি করে থাকেন। ফাহমুস সালাফ সেই ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলা চলে।

মাওলানা ইমরান রাইহান
লেখক। অনুবাদক।

বই :	ফাহমুস সালাফ
গ্রন্থনা :	ইফতেখার সিফাত
সম্পাদনা :	মাওলানা মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন
	মাওলানা মুহাম্মাদ মাসরুর
বানান-সমন্বয় :	হুসাইন আহমাদ
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা :	মুহারেব মুহাম্মাদ

ফাহমুস সালাফ

দীন বোঝার কষ্টিপাথর

গ্রন্থনা
ইফতেখার সিফাত

প্রকাশকাল : বইমেলা ২০২২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য : ৳ ২৩০, US $ 5, UK £ 4

পরিবেশনায়
পড়প্রকাশ
দোকান নং ১০৭, ১ম তলা, গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৫১১৮০৮৯০০

মাকতাবাতুন নুর
দোকান নং ৩৩, ২য় তলা, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৬২৯৬৭৩৭১৮

তারুণ্য প্রকাশন
দোকান নং ১৩, ২য় তলা, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৯৭৯৪৫৬৭২২

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, ওয়াফিলাইফ, ইস্তিকামাহ শপ, মুওয়াহহিদাহ বুকশপ
আমাদের স্বপ্ন.কম, রুহামা শপ, সিগনেচার

বইমেলা পরিবেশক
নহলী

সিজদাহ পাবলিকেশন
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৮১২৬২২৪৪২
sijdahpaulication@gmail.com
www.sijdahpublication.com

নজরানা

আমাদের পরিবারের সবচেয়ে মনোযোগী পাঠক যিনি ছিলেন,
প্রাণপ্রিয় দাদুমণির রুহের মাগফিরাত কামনায়!

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الظَّالِمِيْنَ.

ইসলাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কর্তৃক মনোনীত একমাত্র ও গ্রহণযোগ্য দীন। কুরআনে কারিমের ঘোষণা হলো, আল্লাহ তাআলার নিকট ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মমত গ্রহণযোগ্য নয়। যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মমত গ্রহণ করবে, প্রকৃত বিচারে সে কিছুই পাবে না; বরং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা কিয়ামাত পর্যন্ত সমস্ত হুকুমসহ ইসলামকে সংরক্ষণ করবেন। এই দীনে ইসলামে কোনো ধরনের বিচ্যুতি বা বিকৃতি আসন গেড়ে বসতে পারবে না।

তবে হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী যুগে যুগে ইসলামের নামে ইসলামের মাঝে বিভিন্ন মতবাদ ও নানা দৃষ্টিভঙ্গি প্রবেশ করানোর চেষ্টা করা হবে। এমন অসংখ্য চিন্তা ও মতামতকে ইসলাম বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে, প্রকৃত অর্থে যা ইসলাম নয়। তাই বিশুদ্ধ দীন গ্রহণ ও সামগ্রীক জীবনে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর এই মনোনীত দীন কীভাবে সংরক্ষণ করেন, সে উসুল ও ধারার সাথে পরিচিতি লাভ করা। অর্থাৎ বিশুদ্ধ দীন পেতে হলে, তা কীভাবে ও কাদের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে সে সম্পর্কে অবগতি লাভ

করা আবশ্যক। এতে নিজেদের ঈমান-আমল নিয়ে সমস্ত সংশয় থেকে বাঁচার পাশাপাশি হাজারো পথের মাঝ থেকে সঠিক পথটি চিনে নেওয়া সহজ হবে। বিশেষ করে যখন ইসলামের চির সিদ্ধান্তকৃত ঈমান, কুফর, হালাল-হারামের সীমানাগুলো ভেঙে দেওয়া হচ্ছে ইসলামের নামেই, তখন নিজের ঈমান হেফাজত করার জন্য জরুরি হচ্ছে দীনের প্রকৃত উৎস সম্পর্কে জানা ও দীন কোত্থেকে বুঝতে হয়, সে বিষয়ে ইলম অর্জন করা। তাই ইসলাম কী? এই প্রশ্নের আগে আরেকটি প্রশ্ন আমাদের মাথায় রাখতে হবে, ইসলাম কোথায় ও কীভাবে সংরক্ষিত আছে? হাজারো বক্তব্য ও বয়ানের মাঝে কোন সূত্র থেকে ইসলাম গ্রহণ করা হলে তা বিশুদ্ধ ইসলাম হবে? সে জ্ঞান অর্জন না করলে যেকোনো সময় যে কারোরই বিচ্যুতি ঘটতে পারে। আর সিরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুতি কেবল জাহান্নামের দিকেই ঠেলে দেয়।

নিঃসন্দেহে ইসলামের মৌলিক উৎস হলো কুরআনে কারিম ও সুন্নাতে নববি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যৌক্তিক কিছু কারণে এই দুটো বিষয় আরও দুটি বিষয়কে ইসলামের দলিল হিসেবে সাব্যস্ত করেছে, পরিভাষায় যাকে ইজমা ও কিয়াস বলা হয়। আবার এগুলোর রয়েছে বিস্তারিত তাআরুফ বা পরিচিতি। তাই যেকোনো বিষয়ে দীনের প্রথম ও আদি উৎস কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়াই হলো ইসলামের দাবি। কুরআনে কারিমের অসংখ্য আয়াত আমাদের এ বিষয়ে নির্দেশ করেছে। ইরশাদ হয়েছে, 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, নির্দেশ মান্য করো রাসুলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ো, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি অর্পণ করো, যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত-দিবসের ওপর বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।'[১]

প্রশ্ন হলো কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়ার পদ্ধতিটি কেমন হবে। আমরা কি কুরআন ও হাদিসের মূলপাঠ তথা টেক্সট নিয়ে নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করে তার ওপর আমল করতে শুরু করব, নাকি আমরা দেখব, যাদের ওপর এই কুরআনে কারিম ও হাদিসগুলো অবতীর্ণ হয়েছে তারা এই টেক্সটের ওপর কীভাবে আমল করেছেন? ইনসাফের দাবি হলো, আমরা অবশ্যই কুরআন ও হাদিসের ওপর

১. সুরা নিসা, আয়াত ৫৯

সেভাবে আমল করব, যেভাবে আমল করেছেন তারা, যাদের ওপর তা অবতীর্ণ হয়েছে। অল্প কথায়, কুরআন ও হাদিস প্রথম যাদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা এবং তাদের পরবর্তী তিন যুগের আলেমদের একসাথে বলা হয় 'সালাফ'। আর কুরআন ও হাদিসের নুসুস বা টেক্সটের ক্ষেত্রে তাদের বুঝকে বলা হয় 'ফাহমুস সালাফ'। কুরআন ও হাদিস থেকে দীনে ইসলামকে বিশুদ্ধভাবে বোঝার জন্য জরুরি হচ্ছে, ফাহমুস সালাফকে বোঝা এবং তা থেকে দীনকে গ্রহণ করা। যদি এর ব্যত্যয় ঘটে, অর্থাৎ নুসুস বোঝার ক্ষেত্রে ফাহমুস সালাফকে গ্রহণ করা না হয়, তাহলে দীনে ইসলামে বিকৃতি ও বিচ্যুতির ধারা উন্মুক্ত হবে। যেভাবে হয়েছে পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতে। মানুষের সীমাবদ্ধ চিন্তা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে এমন বিষয়কেও বৈধ করে দেবে, ইসলামে যা হালাল হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তাই বিশুদ্ধ দীনের বুঝ অর্জন করতে ও তার ওপর আমল করতে প্রয়োজন তাদের বুঝকে গ্রহণ করা, যারা এই দীনের প্রথম মুখাতাব বা নির্দেশপ্রাপ্ত। আর তারাই হলেন সালাফ। তাদের বুঝকেই বলা হয় ফাহমুস সালাফ।

লেখক ও চিন্তাবিদ মাওলানা ইফতেখার সিফাত এই বইতে ফাহম, ফাহমুস সালাফ পরিচিতি, ফাহমুস সালাফের প্রয়োজনীয়তা ও ফাহমুস সালাফ থেকে বিচ্যুত হলে মানুষ কীভাবে দীন থেকে বিচ্যুত হয় তা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এ ছাড়াও আধুনিক চিন্তাধারী কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ফাহমুস সালাফ বিষয়ে বেশ কিছু সংশয়েরও তিনি সমাধান দিয়েছেন খুব সুন্দরভাবে। জানামতে বাংলা ভাষায় এমন কাজ এই প্রথম। ফিতনার সময় ঈমানকে হেফাজত করতে এবং দীনকে সঠিকভাবে বুঝতে এই কিতাব অনেকভাবে সাহায্য করবে, ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ তাআলা এই কিতাবের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আখিরাতে নাজাতের অসিলা হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন

সম্পাদকের অভিমত

উম্মতে মুহাম্মাদির অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের দীন ও শরিয়াতের উৎস কুরআন ও সুন্নাহকে কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত ও অপরিবর্তিত রাখার জিম্মাদারি নিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ.

> 'বস্তুত এই কুরআন আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর রক্ষাকর্তা।'[২]

অতঃপর এই সংরক্ষণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য রাব্বুল আলামিন কিছু সুসংহত ঐশী নিজাম প্রবর্তন করেছেন। প্রথমত এমন এক কাফেলা সৃজন করেছেন, দীনের ব্যাপারে যাদের আমানতদারিতা ও আত্মত্যাগের কোনো নজির ইতঃপূর্বে নেই। বুঝ ও মেধাশক্তিতে যাদের তুলনা নেই। শরিয়াহ সংরক্ষণের জন্য যাদের থেকে উত্তম মানবকাফেলা আর হতে পারে না। তারা নিজেদের সর্বস্ব বিনিয়োগ করে এই দীন সংরক্ষণের গুরুদায়িত্ব আনজাম দিয়েছেন এবং পরবর্তীদের কাছেও পূর্ণ আমানতদারিতার সঙ্গে পৌঁছে দিয়েছেন। পরবর্তী প্রজন্মও একই ধারাবাহিকতায় শরিয়াহর মর্ম বোঝা, সংরক্ষণ করা এবং পৌঁছে দেওয়ার আমানত রক্ষা করেছেন।

---

২. সুরা হিজর, আয়াত ৯

তারা শরিয়াহর নুসুসকে প্রতিটি শব্দ-বাক্যসহ যেমন রপ্ত করেছেন, তেমন এই নুসুসের ব্যাখ্যা ও অন্তর্নিহিত মর্মও সংরক্ষণ করেছেন। সুতরাং শব্দের বাহ্যিক দিকটি যেমন রক্ষিত, শব্দের ভেতরগত ফাহমও সংরক্ষিত। তাই কুরআন ও সুন্নাহর এমন কোনো নতুন ব্যাখ্যার অবকাশ নেই, সালাফ থেকে যা উদ্ধৃত নয়, কিংবা সালাফের প্রমাণিত মূলনীতির আলোকে সুবিদিত নয়।

প্রখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'যদি তোমরা অনুসরণ করতে চাও, তাহলে আসহাবে মুহাম্মাদের পথ অবলম্বন করো। অন্তরের দিক থেকে যারা ছিলেন উম্মাহর পবিত্রতম পুরুষ। ইলমের দিক থেকে সুগভীর, যাবতীয় কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত; সততা-স্বচ্ছতা ও হেদায়াতের ক্ষেত্রে উম্মাহর মূর্তপ্রতীক। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গী হিসেবে, দীনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্বাচন করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের মর্যাদা উপলব্ধি করো, তাদের পথ অনুসরণ করো। কেননা সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর তারা ছিলেন অটল-অবিচল।'[৩]

বিখ্যাত সাহাবি হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'হে কুরআন পাঠকারী সমাজ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের (সাহাবিদের) দেখানো সোজা পথ অবলম্বন করো। আল্লাহর শপথ! যদি তোমরা তাদের পথে দৃঢ় অবিচল থাকতে পারো, তাহলে অনেক দূর অগ্রসর হবে। আর যদি ডান দিকে কিংবা বাম দিকে ছিটকে পড়ো, তাহলে সুদূর গোমরাহিতে পতিত হবে।'[৪]

উপরিউক্ত বাণীসমূহের মতো আরও প্রয়োজনীয় এবং নির্দেশনাপূর্ণ বাণী পূর্বসূরি সালাফদের থেকে বর্ণিত হয়ে এসেছে। যার উদ্দেশ্য হলো, ইসলামি শরিয়াহ বোঝা, উপলব্ধি করা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা এবং পালন করার ক্ষেত্রে পূর্বসূরি সালাফদের বিকল্প নেই। বস্তুত দীনের প্রতিটি বিষয় পরম্পরাগত সূত্রে আবদ্ধ। বর্ণনা ও সংরক্ষণের এই ধারা যুগ পরম্পরায় সূত্রের মাধ্যমে চলে আসছে। এখানে নতুন কোনো বিষয় অনুপ্রবেশের সুযোগ নেই।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, 'মাসাদিরে শরিয়াহ'র ক্ষেত্রে পূর্বসূরি সালাফদের এই

---

৩. জামিউ বায়ানিল ইলম, ১৮১০

৪. জামিউ বায়ানিল ইলম, ১৮০৯

চিন্তা ও দর্শন বারবার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে। কখনো শত্রুর বেশে, কখনো ইসলামের ছদ্মনামে। স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষ ও অপরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারীরা এই ফিতনায় পতিত হয়ে যায়। এজন্য তাদেরকে জাগ্রত ও সচেতন করা সময়ের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রচিত হয়েছে। লেখক এখানে সালাফদের অনুসরণের বিষয়টি যথেষ্ট বিশ্লেষণ করেছেন এবং বিভিন্নভাবে প্রমাণিত করেছেন। এ ব্যাপারে মোটাদাগে যে আপত্তিগুলো এসে থাকে, সেগুলোর নিরসনও করেছেন। বইটি পড়ার পর আমার মনে হয়েছে, এই বইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি অংশই উপকারী ও প্রয়োজনীয়। চলমান সময়ে চিন্তার স্বাধীনতা বা ইলম আহরণের ক্ষেত্রে বাধাহীন বিচরণের শিরোনামে যে বিভ্রান্তিগুলো তৈরি হচ্ছে, সেগুলো মোকাবিলা করা এবং নিজের অবস্থান সঠিক রাখার ক্ষেত্রে বইটি বিরাট ভূমিকা রাখবে, ইনশাআল্লাহ।

একজন সম্পাদক হিসেবে যে পরিমাণ ইলম, পাণ্ডিত্য ও গভীরতার প্রয়োজন, তার কিছুই আমার নেই। কেবল দীনি সম্পর্ক ও হৃদ্যতার খাতিরে এবং নিষ্ঠাপূর্ণ একটি কাজের সাওয়াব অর্জনের তাগিদে বইটি দেখার সুযোগ হয়েছে।

সর্বোপরি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে অবনত মস্তকে হেদায়াত প্রার্থনা করছি। যাবতীয় গোমরাহি থেকে তাঁর কাছে পানাহ চাই। তিনি যেন ইখলাস দান করেন এবং আমাদের আমলগুলো কবুল করেন। আমিন।

মাওলানা মুহাম্মাদ মাসরুর

সূচিপত্র

লেখকের কথা

ইউরোপে সেকুলারিজমের উৎপত্তির পর সেখানকার সমাজে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে। এর মধ্যে গির্জাকেন্দ্রিক এমন দুটি পরিবর্তন ঘটেছিল, যা সমাজ থেকে খ্রিষ্টধর্মের প্রভাবকে একেবারে বিলুপ্ত করে দেয়। প্রথম পরিবর্তনটি হলো ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিভাজন, অর্থাৎ রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। ধর্ম যে যার ব্যক্তিগত পরিসরে পালন করবে। এই বিভাজনের ফলে মানুষের সামাজিক ও সামষ্টিক জীবন থেকে ধর্মের প্রভাব বিলুপ্ত হতে থাকে। এই পরিবর্তনটি ছিল গির্জার সাথে সংশ্লিষ্ট, তবে গির্জার বাইরের বিষয়। এটাকেই ইউরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

দ্বিতীয় পরিবর্তনটি ঘটে গির্জার একেবারে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে। সেই পরিবর্তনটা ছিল ধর্মীয় টেক্সট ব্যাখ্যা অথরিটিকে অবাধকরণ। পোপদের অসততার সুযোগে মার্টিন লুথারের মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্মের ভেতর রিফরমেশন আন্দোলন শুরু হয়।[৫] এই আন্দোলন আপাত পোপতন্ত্রের[৬] বিরুদ্ধে হলেও এটির ফলাফল ছিল ভয়াবহ।

---

৫. ১৬ শতকে গির্জাকেন্দ্রিক নানা সমস্যা থেকে খ্রিষ্টধর্মে প্রতিবাদপন্থি সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়। এই আন্দোলনকেই রিফরমেশন আন্দোলন বলা হয়। এর মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টধর্মে একদমই নতুন একটি ধারা সৃষ্টি হয়। যাদেরকে 'প্রোটেস্টান্ট' নামে ডাকা হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে লেখকের অনূদিত রুহামা পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত *ইতিহাসের আয়নায় বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা* বইটি পড়া যেতে পারে।

৬. ক্যাথলিক গির্জার একচ্ছত্র নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে 'পোপতন্ত্র' বলা হয়। এই কর্তৃত্বের ভিত্তিতে

এই আন্দোলনের ফলে খ্রিষ্টানদের ভেতর বিভাজন হয়ে প্রোটেস্টান্ট ধারার সূচনা হয়। এই আন্দোলন একদিকে খ্রিষ্টান ধর্মকে নতুন করে বিকৃত করে (যদিও আগ থেকেই খ্রিষ্টধর্ম বিকৃত হয়ে আসছিল) তার বিদ্যমান মূল কাঠামো ও প্রভাবকে ধ্বংস করে দেয়। অন্যদিকে ধর্মীয় টেক্সট, বিধান ইত্যাদিকে ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা সাধারণ থেকে বিশেষ—সবার জন্য অবাধ করে দেয়।

আমরা যদি উপরোক্ত দুটি বাস্তবতাকে মিলিয়ে আরও স্পষ্ট করে বলি, তবে বলতে হবে, ধর্মকে ব্যাখ্যা করা এবং বেঁধে দেওয়ার ক্ষমতা চলে আসে এমন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের হাতে, যারা ধর্মকে তার বিধিবদ্ধতা ও যথাযথ মর্যাদাসহ গ্রহণ করতে আন্তরিক নয়। অল্প কথায়, একে সেকুলার অথরিটি বলা যায়। এখন সেই অথরিটি ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্র যে-কেউ হতে পারে। মোটকথা রিলিজিয়াস টেক্সটের ব্যাখ্যাপ্রণালি তার নিজ কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে সেকুলার মূল্যবোধের কাছে জিম্মি হয়ে যায়। এর ফলে ইউরোপে যেটা হয়, তা হলো, সেকুলার রাষ্ট্র কিংবা ব্যক্তি নিয়মিত খ্রিষ্টধর্মের বিধান ও আইনি কাঠামোকে পরিবর্তন করতে থাকে এবং কোনটা ধর্ম ও কোনটা ধর্ম না সেটাও তারা ঠিক করে দিতে থাকে।

এখান থেকে আমাদের সামনে এটাও স্পষ্ট হয় যে, সেকুলারিজম ঐতিহাসিক ও উৎপত্তিগতভাবে যে কাজটা আজ অবধি করে আসছে, সেটা তার প্রচলিত সংজ্ঞার সাথে মেলে না। সেকুলারিজম সব ধর্মকে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা বলে ধর্মগুলোকে আসলে তার নিজের তৈরি একটি বাক্সের মধ্যে বন্দি করে দিচ্ছে এবং সে-ই ঠিক করে দিচ্ছে কোনটা ধর্ম আর কোনটা ধর্ম না, কোনটা ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা আর কোনটা সঠিক ব্যাখ্যা না, কোন জায়গায় ধর্ম চলবে আর কোন জায়গায় চলবে না। যাই হোক সেকুলারিজম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা এখানে আমার উদ্দেশ্য না। ধর্মকে মনমতো ব্যাখ্যা কিংবা রিফরমেশন করার যে ধারা ইউরোপে জন্ম হয়েছিল, আমি এখানে তার মৌলিক রূপটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

গির্জার পোপরা খ্রিষ্টধর্ম শেখা, বোঝা ও পোপ হওয়ার অধিকারকে তাদের বিশেষ বংশ ও শ্রেণির মাঝে কুক্ষিগত করে রাখত। আধুনিক শিক্ষায় প্রভাবিত কোনো কোনো মুসলিম পোপতন্ত্রের সাথে ইসলামি ইলম অর্জনের সিলসিলাকে তুলনা করে থাকে। এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত একটি তুলনা। বইটির সংশয় নিরসন অংশে আমরা বিষয়টি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

ইউরোপ যখন মুসলিম দেশগুলোতে উপনিবেশবাদ[৭] প্রতিষ্ঠা করে, তখন সে তার সভ্যতার সকল মতাদর্শ মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে যায়; কিংবা চুপিসারে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিয়ে যায়। ফলে মুসলিম-সমাজের ভেতর সেকুলারিজম তার উল্লিখিত সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রবেশ করে এবং মুসলিম-সমাজের ওপর জেঁকে বসে। আর তখনই নতুন করে শরয়ি নুসুস বা টেক্সটকে নিজের মনমতো ব্যাখ্যা করা এবং নিজের মতো করে বোঝার নানা মাত্রিক প্রবণতা শুরু হয়। নানা মাত্রিক বলার কারণ হলো, কুরআন-সুন্নাহর নুসুসকে নিজের মতো করে বোঝা ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যেসব প্রবণতার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, সেগুলোর অবস্থা একরকম নয়। প্রতিটি প্রবণতার খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা না করে আমরা এমন একটি মৌলিক পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি, যা মূলত সবগুলো প্রবণতার মধ্যেই রয়েছে। তা হলো, শরয়ি নুসুস বোঝার ক্ষেত্রে সালাফদের ফাহম (বুঝ) ও মানহাজ (পদ্ধতি) উপেক্ষা করা। তথা সালাফরা যেভাবে কুরআন-সুন্নাহ বুঝেছেন এবং যে পদ্ধতি অনুসারে তা ব্যাখ্যা করেছেন, সে বুঝ ও ব্যাখ্যার পদ্ধতি থেকে সরে যাওয়া এবং তা উপেক্ষা করা।

কেউ কেউ সাধারণভাবেই সালাফদের ফাহম ও মানহাজকে প্রত্যাখ্যান করে, আবার কেউ কেউ বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তা উপেক্ষা করে থাকে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং পরবর্তী সময়ে সালাফদের যুগ হয়ে প্রজন্ম পরম্পরায় শরয়ি নুসুসের (কুরআন ও হাদিসের) ধারাবাহিক যে জ্ঞান ও বুঝ আমরা লাভ করেছি, তাকে বলা হয় 'ইলমে মুতাওয়ারিস' ও 'ফাহমে মুতাওয়ারিস'। যুগে যুগে ইসলামকে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধ্যানধারণা ও বিকৃতি থেকে রক্ষা করেছে এই মুতাওয়ারিস ধারার নিরবচ্ছিন্ন ধারা। এই মুতাওয়ারিস ফাহমের[৮] ধারা মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিশেষ রহমত। মহান আল্লাহ এই মজবুত নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই তাঁর দীনকে সংরক্ষণ করে আসছেন। যেমনটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

৭. উপনিবেশবাদ বলা হয়, একটি দেশ কর্তৃক অন্য দেশে সার্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। ১৭শ এবং ১৮শ এর দশকে ইউরোপ মুসলিম বিশ্বসহ পৃথিবীর আরও বেশ কিছু অঞ্চলে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। আমরা এখানে সে উপনিবেশের কথাই বলছি।

৮. নুসুসের সে ব্যাখ্যা ও বুঝ, যা সাহাবিগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে আমাদের কাছে ধারাবাহিকভাবে এসে পৌঁছেছে একটি বিশ্বস্ত মাধ্যম হয়ে।

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُه، يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَ تَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ.

> 'এই উম্মতের প্রত্যেক প্রজন্মের নিষ্ঠাবান শ্রেণি দীনের এই ইলমকে বহন করবে। তারা দীনের ইলমকে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থিদের মিথ্যাচার ও মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে মুক্ত রাখবে।'[৯]

সুতরাং এই নেটওয়ার্ক ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্যও বটে, যা অন্য কোনো ধর্মের নেই। এই কারণে ইসলাম ছাড়া বাকি সব ধর্ম খুব সহজেই বিকৃত হয়ে গেছে। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই মহান আল্লাহ তাআলা ইসলামকে কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত রাখবেন।

ইসলামের ইতিহাসে যত ভ্রান্ত চিন্তা ও ফিরকার জন্ম হয়েছে, সবগুলোর মূল সমস্যা ছিল এই জায়গাটিতে। দীনের মুতাওয়ারিস ইলম ও ফাহম থেকে বেরিয়ে যারাই কোনো নতুনত্বকে বরণ করতে চাইবে, তাদের জন্য সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া এক সুনিশ্চিত বিষয়। বর্তমানেও দীনি অঙ্গনে যত নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে, যত ফিকরি ইনহিতাতের (চিন্তাগত অধঃপতন) প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, দেখা যাবে সবগুলোর মূল সংকট এখানেই।

ইসলামকে বিকৃত করে পশ্চিমা সভ্যতা ও মতাদর্শগুলোর সাথে সামঞ্জস্যশীল করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো, সালাফে সালেহিনের মুতাওয়ারিস ফাহম। এজন্য পশ্চিমের প্রাচ্যবাদী বিভিন্ন সংস্থাও সালাফে সালেহিনের ফাহমের তিরস্কার করেছে। দীনের এই মুতাওয়ারিস ফাহম ও ইলমকে জড়, আবদ্ধ, পুরোনো, কট্টর ইত্যাদি শব্দে আখ্যায়িত করেছে। এমনকি তারা মডার্নিস্ট মুসলিমদেরকে এর বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত তৈরির জন্যও আহবান করেছে। এজন্য আমরা দেখব, সমস্ত ভ্রান্ত ফিরকাসহ পশ্চিমা সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত মডার্নিস্ট স্কলার ও মুসলিম দীনের মুতাওয়ারিস ফাহম ও মানহাজের তোয়াক্কা করে না; বরং তারা বিভিন্ন স্লোগান ও ভ্রান্ত যুক্তির আড়ালে মুতাওয়ারিস এই ধারাকে প্রশ্নবিদ্ধ ও গুরুত্বহীন করার অপপ্রয়াস করছে।

---

৯. মুসনাদুশ শামিয়িন, তাবারানি, হাদিস নং ৫৯৯; সুনানে কুবরা, বায়হাকি, হাদিস নং ২০৯১১, সনদ সহিহ।

ফলে আধুনিক সময়ে সালাফে সালেহিন থেকে প্রাপ্ত মুতাওয়ারিস ফাহম ও মানহাজের ওপর যত প্রকার আঘাত আসছে এবং বিষয়টিকে কেন্দ্র করে যত প্রকার নৈরাজ্য চালানো হচ্ছে, সেগুলোকে দমন করার জন্য বিষয়টি উম্মাহর সামনে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা জরুরি। সে লক্ষ্যেই আমরা এই বইটিতে সালাফদের পরিচয়, তাদের ফাহমের গুরুত্ব, প্রামাণিকতা এবং এর ওপর আপত্তিসমূহের নিরসন তুলে ধরার চেষ্টা করব। এ ক্ষেত্রে আমরা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করব না; বরং সামগ্রিকভাবে সাধারণত যেসব আপত্তি আসে এবং আমরা সচরাচর যেসব আপত্তির সম্মুখীন হই, সেগুলো উল্লেখপূর্বক নিরসন করার চেষ্টা করব।

বইয়ের মূল পাঠে যাওয়ার পূর্বে পাঠককে একটি বিষয়টি জানিয়ে রাখা সমীচিন মনে করছি। বইটির বিষয়বস্তু কিছুটা কঠিন। কারণ এটি একটি উসুলি তথা মূলনীতিধর্মী গ্রন্থ। বিষয়বস্তুর মূলভাব রক্ষা করে আমি সাধ্য অনুযায়ী সহজ করার চেষ্টা করেছি। তবে বিষয়টি যেহেতু চিন্তার, তাই পাঠককে একটু মনোযোগ ও চিন্তার সাথেই পড়তে হবে। সামান্য চিন্তা করে আমরা যদি দীনের এই কষ্টিপাথরকে ভারসাম্যপূর্ণভাবে বুঝে নিতে পারি, তাহলে আমাদের চিন্তার জগতে একটি দুর্গ প্রতিষ্ঠা হবে বলে আশা করি। যে দুর্গ থেকে আমরা চিন্তার ময়দানের সকল আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারব এবং নিজেদের চিন্তাকাঠামোকে ভ্রান্তির আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারব।

বইটি লেখার ক্ষেত্রে আমি বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে উপকৃত হয়েছি। এর মধ্যে হাকিমুল উম্মত হজরত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রহিমাহুল্লাহর আল ইন্তিবাহাতুল মুফিদাহ, আল্লামা তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লার *ইসলাম আওর জিদ্দাত পছন্দি* ও বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং শায়খ ফাহাদ বিন সালেহ আল আজলান হাফিজাহুল্লাহর বিভিন্ন প্রবন্ধ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বইটির মৌলিক কাঠামো গ্রহণ করেছি ফাহমুস সালাফ লিন *নুসুসিশ শরইয়্যাহ ওয়ার রদ্দু আলাশ শুবহাতি হাওলাহু* নামক গ্রন্থ থেকে। এই গ্রন্থের বেশ কিছু আলোচনার সাথে আমি একমত নই এবং বইটিতে সামগ্রিকভাবে কিছু বিষয়ের শূন্যতাও অনুভব করি। যার দরুন গ্রন্থটির হুবহু অনুবাদ করার পরিবর্তে আমি তা সামনে রেখে উপযুক্ত সংযোজন ও বিয়োজনের প্রয়োজন বোধ করি এবং সেই বোধ থেকে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি প্রস্তুত করি।

মানুষ হিসেবে কখনোই বইটির কোনো আলোচনাকে আমি ভুলের ঊর্ধ্বে মনে করি না। বিজ্ঞ পাঠকের চোখে যৌক্তিক কোনো ভুল প্রকাশ পেলে অবশ্যই লেখক কিংবা প্রকাশনীকে অবগত করার অনুরোধ থাকবে। আমরা দালিলিক ও যৌক্তিক আপত্তি পেলে অবশ্যই সেই ভুল সংশোধন করে নেব, ইনশাআল্লাহ।

মুহতারাম মাওলানা আফসারুদ্দীন হাফিজাহুল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মাদ মাসরুর, মাওলানা ইমরান রাইহান, মাওলানা সাজ্জাদ হুসাইন, মাওলানা কায়েস শরীফ, মাওলানা হুসাইন আহমাদ—সম্মানিত এই মানুষগুলোর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সম্পাদনা, নজরে সানি, প্রুফ দেখাসহ প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে বইটিকে প্রকাশযোগ্য করে তুলতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের খেদমত কবুল করে নেন এবং বইটির মাধ্যমে উম্মাহর ভেতর স্বর্ণযুগের চিন্তাচেতনা ও আদর্শ পুরুজ্জীবিত করে দেন। আমিন।

ইফতেখার সিফাত

১৬ জুমাদাল আখিরাহ ১৪৪৩

ফাহমুস সালাফ পরিচিতি

ফাহম শব্দের অর্থ

ফাহম-এর শাব্দিক অর্থ হলো, অন্তর দিয়ে কোনো জিনিসকে বোঝা।[১০]

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ফাহম হচ্ছে এমন বোধ-বুদ্ধি, যার মাধ্যমে ব্যক্তি অন্যের বক্তব্যকে সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ বুঝতে পারে।'[১১]

ফাহম, ইলম, ফিকহ এই শব্দগুলো কাছাকাছি অর্থ ধারণ করে। তাফসির শব্দটিও ফাহমের অন্তর্ভুক্ত। প্রজন্ম পরম্পরায় লেখা ও বর্ণনার মাধ্যমে যে তাফসির ও তাফসিরগ্রন্থ আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তা সালাফদের ফাহমেরই একটি অংশ, তবে পরিপূর্ণ অংশ নয়। কারণ এর বাইরেও সালাফদের আরও ফাহম আছে, যা ফিকহ ও হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

ফাহম দুই প্রকার : বিধানগত ফাহম ও চিন্তাগত ফাহম

বিধানগত ফাহম হলো, যার মাধ্যমে দলিল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যার থেকে শরয়ি বিধান আহরণ করা হয়। এ ধরনের ফাহম অর্জনের ক্ষেত্রে ঈমান ও তাকওয়ার

১০. লিসানুল আরব, ১২/৪৫৯
১১. ফাতহুল বারি, ১/১৯৯

পাশাপাশি নুসুস আসার প্রেক্ষাপট, অন্যান্য নুসুস বিবেচনা, ভাষাজ্ঞান, মুফাসসিরে কেরাম, মুহাদ্দিসিনে কেরাম ও ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য ইত্যাদি বিষয় সহায়ক হয়ে থাকে।

আর চিন্তাগত ফাহম হলো, প্রথমোক্ত ফাহম থেকে গভীর চিন্তাভাবনার মাধ্যমে যে সূক্ষ্ম জ্ঞান হাসিল হয়। এ ধরনের ফাহমকে আমরা সাধারণত তাদাব্বুর হিসেবে চিনে থাকি। এমন ফাহম অর্জনের ক্ষেত্রে চিন্তার গভীরতা, হৃদয়ের স্বচ্ছতা ও ঈমানি মজবুতির প্রয়োজন হয়।[১২]

সালাফ শব্দের শাব্দিক অর্থ

শাব্দিক অর্থের সাথে সংশ্লিষ্টতা রেখেই প্রতিটি পরিভাষা তৈরি হয়। সালাফ-এর শাব্দিক অর্থের সাথে পারিভাষিক অর্থের একটি সম্পর্ক আছে। এজন্য আমরা আগে সালাফ-এর শাব্দিক অর্থ জেনে নেব।

সালাফ-এর শাব্দিক অর্থ গত হওয়া।[১৩] একই শব্দ যখন ইসমুল ফায়েল তথা কর্তা অর্থে ব্যবহার হয় তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়—বাপদাদা ও আত্মীয়স্বজনদের ভেতর থেকে যারা গত হয়েছেন এবং যারা বয়স ও সম্মানে আমাদের থেকে অগ্রগামী। অর্থাৎ যারা আমাদের থেকে বয়সে ও জমানার দিক থেকে ওপরে, তাদের প্রত্যেকেই শাব্দিকভাবে আমাদের জন্য সালিফ বা সালাফ।[১৪]

মোটকথা, সালাফ শব্দের যতগুলো ব্যবহার আছে, প্রায় সবগুলোর মাঝেই অতীত ও বিগত সময়, কিংবা পূর্ববর্তী প্রজন্ম—এ জাতীয় অর্থ পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনেও এ অর্থে সালাফ শব্দটি এসেছে। যেমন :

---

১২. মূলত ফাহমের এই দ্বিতীয় প্রকারটিই কিয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে। এই ফাহমের জগতে কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন তার রহস্য-ভাণ্ডার চিন্তাশীলদের কাছে উন্মোচন করে যাবে। এমনকি পরবর্তীরা এমন কোনো ফাহমও উদ্ধার করতে পারে, যা পূর্বের কেউ পারেনি। তবে দ্বিতীয় প্রকার এই ফাহমের সাথে বিধানের কোনো সম্পর্ক নেই এবং তা বিশুদ্ধ ও নিরাপদ হওয়ার জন্য জরুরি হলো, প্রথম প্রকার ফাহমকে সামনে রাখা। অর্থাৎ প্রথম প্রকারের ফাহম কারও অর্জন না হলে তার দ্বিতীয় প্রকারের ফাহমের ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ঘটবে–এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৩. মুজামু মাকায়িসিল লুগাহ লি ইবনি ফারিস, ৩/৯৫

১৪. লিসানুল আরব, ৯/১৫৯

- গত হওয়া

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ.

'(হে নবি!) যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদেরকে বলে দাও, তারা যদি নিবৃত্ত হয়, তবে অতীতে যা-কিছু হয়েছে তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কিন্তু তারা যদি পুনরায় সে কাজই করে, তবে পূর্ববর্তী লোকদের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে, তা তো (তাদের সামনে) রয়েছেই।'[১৫]

- অতীত সম্প্রদায়

فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّ مَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ.

'আর তাদেরকে আমি এক বিগত জাতি এবং অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিলাম।'[১৬]

অনুরূপ হাদিস শরিফেও সালাফ শব্দের ব্যবহার এসেছে। যেমন এক হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মৃত্যু ঘনিয়ে আসার সংবাদ হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে শোনাতে গিয়ে বলেন,

نِعْمَ السَّلَفُ أَنا لَكِ.

'আমিই তোমার জন্য সর্বোত্তম অগ্রগমনকারী।'[১৭]

পারিভাষিক অর্থ

পারিভাষিকভাবে সালাফ শব্দের দুটি প্রয়োগক্ষেত্র আমরা তুলে ধরতে পারি।

এক. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু-পরবর্তী (শ্রেষ্ঠ তিন প্রজন্মের) নির্দিষ্ট সময়ের ওপর সালাফ শব্দের প্রয়োগ। এটিই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও ব্যবহৃত প্রয়োগ। এ ক্ষেত্রে ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয় উত্তম জমানাকেন্দ্রিক

---

১৫. সুরা আনফাল, আয়াত ৩৮

১৬. সুরা জুখরুফ, আয়াত ৫৬

১৭. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬২৮৫

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস। তিনি বলেন,

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো আমার প্রজন্ম, অতঃপর তাদের পরবর্তী প্রজন্ম, এরপর তাদের পরবর্তী প্রজন্ম।'[১৮]

এই হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের যুগ ও পরবর্তী দুই যুগকে পর্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠ যুগ বা প্রজন্ম হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ফলে জমহুর উলামায়ে কেরাম সাহাবি, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়ি—এই তিন প্রজন্মকে হাদিসে বর্ণিত শ্রেষ্ঠত্বের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। তবে কেউ কেউ মনে করেন, খাইরুল কুরুনের সময়টি তাবেয়িদের পর্যন্তই নির্দিষ্ট। আবার কেউ কেউ একটু পিছিয়ে খাইরুল কুরুনকে কেবল সাহাবিদের যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করেন। অন্যদিকে পাঁচশ হিজরির পূর্ব পর্যন্ত খাইরুল কুরুন সম্প্রসারিত করার ব্যাপারেও কারও কারও মত পাওয়া যায়। এগুলো হলো কিছু আলেমের অভিমত। কিন্তু যুগ যুগ ধরে অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম গ্রহণযোগ্য মতানুসারে হাদিসে বর্ণিত বিন্যাস অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িদের প্রজন্মকে শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম হিসেবে বিবেচনা করে আসছেন।

প্রকৃতপক্ষে খাইরুল কুরুনের সময়ের ব্যাপ্তি জানার জন্য আমাদেরকে হাদিসে বর্ণিত 'করনুন' (قَرْنٌ) শব্দটির ব্যাখ্যা জানতে হবে। করনুন এর শাব্দিক অর্থ হলো, জমানার নির্দিষ্ট সময়।[১৯] আর ইবনুল আসির রহিমাহুল্লাহর মতে করনুন মানে হলো, প্রত্যেক জমানার অধিবাসীরা।[২০]

পারিভাষিক অর্থে করনুন শব্দ নিয়ে মৌলিকভাবে দুটি অভিমত রয়েছে।

১. প্রথম অভিমতের পক্ষের ভাষাবিদদের মতে করনুন বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়-কালকে বোঝায়। তাদের মধ্যে করনুন-এর সময়ের ব্যাপ্তি নিয়ে ১০ বছর থেকে ১২০ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন মতামত রয়েছে। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মত হলো, ১০০ বছরে এক করনুন হয়। এই মতের পক্ষে হাদিসেরও দলিল আছে। সাহাবি

---

১৮. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ২৬৫১; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৩৫

১৯. তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ৩/২৬৯

২০. আন নিহায়াহ, ৪/৫১

আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাথায় তার হাত রেখে বললেন, "এই ছেলে এক করনুন সময় বেঁচে থাকবে।" পরে দেখা গেছে তিনি ১০০ বছর জীবিত ছিলেন।'[২১]

২. দ্বিতীয় মত তাদের, যারা করনুন এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময়-কাল নির্ধারণ করেন না; বরং তারা করনুন বলতে প্রত্যেক জমানার লোকদের গড় আয়ু বা তাদের জীবিত থাকার একটি মধ্যবর্তী বয়সসীমার যে সময়-কাল, সেটিকে বোঝান। ইবনে হাজার আসকালানি রহিমাহুল্লাহ এই অভিমতকেই সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বিষয়টিকে এভাবে ব্যক্ত করেন, 'করনুন কোনো একটি জমানার কাছাকাছি বয়সের মানুষদের বোঝায়। যারা নির্দিষ্ট বিষয়ে পরস্পরে সম্পৃক্ত।' এর ভিত্তিতে তিনি বলেন, 'সুতরাং করনুন এর সময়সীমা প্রত্যেক জমানার বাসিন্দাদের বয়সসীমা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্নও হতে পারে।'[২২]

আবার আল্লামা হারবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'করনুন বলা হয় প্রত্যেক যুগের নিঃশেষ হওয়া জাতিকে, যাদের আর কোনো সদস্য অবশিষ্ট বা জীবিত নেই।'[২৩]

মূলত এই সব অভিমতের ভেতর বড় ধরনের কোনো বিরোধ নেই। যতটুকু বিরোধ আমাদের সামনে দৃশ্যমান, এর মধ্য থেকে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহিমাহুল্লাহর অভিমতকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা একটি ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি।

আর তা এই জন্য যে, হাদিসে এসেছে রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের স্বাভাবিক বয়স ষাট হতে সত্তর বছরের মাঝে হবে এবং তাদের কম সংখ্যকই এই বয়সসীমা পার করবে।[২৪] বাস্তবেও বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। ইবনে হাজার আসকালানি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ঐতিহাসিকরা একমত যে, সর্বশেষ তাবে-তাবেয়ি মৃত্যুবরণ করেন ২২০ হিজরিতে। এরপর থেকেই বিদআতের প্রকাশ ঘটতে থাকে, মুতাজিলাদের ভয়াবহ জবান চলতে শুরু করে,

---

২১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/৪০৪; সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহাহ, হাদিস নং ২৬৬০

২২. ফাতহুল বারি, ৭/৮

২৩. তাহজিবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ৩/২৬৯

২৪. সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ২৩৩১, সনদ হাসান।

দার্শনিকরা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, আহলে ইলমরা খলকে কুরআনের মাসআলা নিয়ে পরীক্ষার শিকার হন এবং যুগের অবস্থা অনেক পরিবর্তন হয়ে যায়।[২৫]

সুতরাং রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ হলো সাহাবায়ে কেরামের যুগ, সাহাবিদের যুগ হলো তাবেয়িদের, আর তাবেয়িদের যুগ হলো তাবে-তাবেয়িদের।[২৬] অর্থাৎ হাদিসে বর্ণিত প্রথম করনুন হলো যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেয়েছেন। দ্বিতীয় করনুন হলো যারা সাহাবিদের পেয়েছেন। আর তৃতীয় করনুন হলো যারা তাবেয়িদের পেয়েছেন। যার ফলাফল দাঁড়ায়—সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িরা হলেন হাদিসে বর্ণিত শ্রেষ্ঠ তিন প্রজন্মের মানুষ। এর স্বপক্ষে অনেক হাদিসও পাওয়া যায়।

সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য পাওয়ার কারণে, তাবেয়িদের শ্রেষ্ঠত্ব সাহাবিদের সান্নিধ্য ও তাদের থেকে ইলমে দীন লাভ করার কারণে, আর তাবে-তাবিয়েদের শ্রেষ্ঠত্ব সাহাবিদের সান্নিধ্য যারা পেয়েছেন তাদেরকে দেখার জন্য।

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করে বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'লোকেদের ওপর এমন একসময় আসবে, যখন তাদের বিরাট সৈন্যবাহিনী জিহাদের জন্য বের হবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি, যিনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য লাভ করেছেন? তাঁরা বলবেন, হ্যাঁ আছেন। তখন তাদেরকে জয়ী করা হবে। অতঃপর মানুষের ওপর পুনরায় এমন একসময় আসবে, যখন তাদের বিরাট বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি, যিনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্যপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির সাহচর্য লাভ করেছেন? তারা বলবেন, হ্যাঁ আছেন। তখন তাদেরকে জয়ী করা হবে। অতঃপর লোকদের ওপর এমন একসময় আসবে, যখন তাদের বিরাট বাহিনী জিহাদে অংশগ্রহণ করবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি, যিনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবিগণের

---

২৫. ফাতহুল বারি, ৭/৮

২৬. শরহুল মুসলিম লিন নববি, ১৬/৮৫

সাহচর্যপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির সাহচর্য লাভ করেছেন? বলা হবে, হ্যাঁ আছেন। তখন তাদেরকে জয়ী করা হবে।'[২৭]

ওয়াসিলাহ ইবনুল আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরেক বর্ণনায় এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের মাঝে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দর্শন লাভ করা ও সাহচর্যপ্রাপ্ত কেউ থাকবে, ততক্ষণ তোমরা কল্যাণের সাথেই থাকবে। আল্লাহর শপথ! ততক্ষণ তোমরা কল্যাণের সাথেই থাকবে, যতক্ষণ তোমাদের মধ্যে আমার সাহাবির দর্শন ও সাহচর্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকবে।'[২৮]

ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এই হাদিসে রাসুলের মুজিযা, সাহাবি, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িদের মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে।'[২৯]

আরেক বর্ণনায় হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, মানুষের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, "আমি এবং আমার সাহাবিরা, এরপর যারা আমার সাহাবিদের পরে আসবে, এরপর যারা তাদের পরে আসবে।"[৩০]

এই সমস্ত হাদিস থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িরা হলেন এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। পারিভাষিকভাবে এই তিন প্রজন্মকেই সালাফ বলে। ইমাম যাহাবি রহিমাহুল্লাহ ৩শ হিজরির শেষ পর্যন্ত সালাফদের জমানার সীমা নির্ধারণ করেছেন। ৩শ তম হিজরিকে তিনি সালাফ ও খালাফের মধ্যবর্তী ফাসেলা (বিভাজক) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৩১]

সালাফ শব্দের আপেক্ষিক একটি ব্যবহারও আছে। যেমন তাবেয়িরা সাহাবিদের ক্ষেত্রে সালাফ শব্দ ব্যবহার করতেন। অনুরূপ তাবে-তাবেয়িরা তাবেয়িদের

---

২৭. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ২৬৪৯; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৩২

২৮. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, হাদিস নং ৩২৪০৭; আল মুজামুল কাবির লিত তাবারানি, হাদিস নং ২০৭, ইবনে হাজার আসকালানি রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারিতে হাদিসটিকে হাসান বলেছেন, ৭/৫

২৯. শরহু মুসলিম, ১৬/২২

৩০. মুসনাদে আহমাদ, ০২/৩৪০, শায়খ শুআইব আরনাউত রহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে জায়্যিদ বলেছেন।

৩১. মিযানুল ইতিদাল, ০১/০৪

ক্ষেত্রে সালাফ শব্দের ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ প্রত্যেক পরবর্তীদের জন্য তাদের পূর্ববর্তীরা হলেন সালাফ। শাব্দিক অর্থে আপেক্ষিকভাবে সালাফ শব্দের এমন ব্যবহারও করা যায়। কিন্তু পারিভাষিকভাবে সালাফ বলতে প্রথম তিন জমানাকেই বোঝানো হয়।

আরেকটা ব্যাপার হলো, উল্লিখিত হাদিস থেকে মনে হতে পারে, প্রথম তিন যুগের পর মুসলিমদের ভেতর কোনো কল্যাণ নেই, তারা বিজয় লাভ করবে না, মুসলিম জাতি পরিপূর্ণ অধঃপতিত হয়ে যাবে ইত্যাদি নেতিবাচক বিষয় মাথায় আসতে পারে। মূলত হাদিসের উদ্দেশ্য এমনটা নয়। হাদিসে সালাফদের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে গিয়ে এমন উপস্থাপনা করা হয়েছে। পাশাপাশি আমাদেরকে এই দীক্ষা প্রদান করা হয়েছে যে, কল্যাণ ও সফলতা লাভের জন্য পরবর্তীদেরকে সালাফদের পথেই চলতে হবে। এই ব্যাপারটা সালাফ শব্দের দ্বিতীয় প্রয়োগক্ষেত্র থেকে আরও স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

দুই. সালাফ শব্দের আরেকটি প্রয়োগ হলো আদর্শ বা পদ্ধতিগত। অর্থাৎ ইসলামের যাবতীয় বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের পূর্বসূরিদের থেকে যে মত-পন্থা ও আদর্শ পরম্পরাসূত্রে এসেছে, সেটির ওপরও সালাফ শব্দের প্রয়োগ করা হয়। তবে মনে রাখা দরকার যে, কেবল পূর্ববর্তী জমানায় আগমন করাই অনুসরণীয় সালাফ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

এর দুটি কারণ আছে।

প্রথমত, প্রথম তিন প্রজন্মের জমানাতেও ভ্রান্ত চিন্তার লোক ছিল। যেমন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জমানায় আবদুল্লাহ বিন সাবা ফিতনা ছড়িয়েছিল। আবার হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জমানাতেই খারেজিদের ফিতনা প্রকাশ পায়। সাহাবিদের জমানার শেষ দিকে ৮০ হিজরিতে মাবাদ জুহানির হাতে 'কাদিরিয়া' ফিতনার সূচনা হয়। অনুরূপ ১০৫ হিজরিতে গাইলান আদ দিমাশকির হাতে 'ইরজা'র[৩২] ফিতনা, ওয়াসেল বিন আতার মাধ্যমে ১৩১

---

৩২. ইরজায়ি চিন্তাধারা বলতে বোঝানো হয়, কেউ মুখে মুসলিম দাবি করার পর কোনো কর্ম বা বিশ্বাস তার ঈমানকে নাকচ করে না বলে ধারণা রাখা। এই চিন্তাধারার অধিকারী দলটি মুরজিয়া নামে পরিচিত। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ঐকমত্যে, এটি একটি ভ্রান্ত দল।

হিজরিতে 'ইতিজালে'র[৩৩] ফিতনার প্রাদুর্ভাব ঘটে। তবে এরা ছিল সমাজের বিচ্ছিন্ন ও বিরল শ্রেণি। এজন্য প্রথম তিন জমানার হলেই কেউ আমাদের জন্য অনুসরণীয় সালাফ হয়ে যাবে না। তাই অনুসরণীয় সালাফদের কাতার থেকে ভ্রান্ত, বাতিল ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের বের করার জন্য সালাফদের একটি আদর্শ বা পদ্ধতিগত পরিচয় আমাদের জানা থাকা দরকার।

দ্বিতীয়ত, সালাফদের ফাহম ও মানহাজ আমাদের জন্য নুসুসে শরিয়াহ বোঝার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিষয়। তবে আমরা সালাফ পর্যন্ত লাফ দিয়েই পৌঁছতে পারব না; বরং তাদের পরবর্তী খালাফদের সিলসিলার মাধ্যমেই সালাফদের পর্যন্ত যেতে হবে। আর এই ক্ষেত্রে খালাফদের থেকে অনুসরণীয় ব্যক্তি বা মতকে পরখ করার জন্য সালাফদের আদর্শ বা পদ্ধতিগত প্রয়োগ জানাটাও আমাদের জন্য জরুরি হয়ে দাঁড়ায়।

ইমাম সাফফারিনি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সালাফদের মানহাজ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সাহাবায়ে কেরাম, তাদের অনুসরণকারী তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িগণ এবং স্বীকৃত আইম্মায়ে কেরাম যে বিষয়ের ওপর ছিলেন। দীনের ব্যাপারে যাদের মর্যাদা ও ইমামাত স্বীকৃত, যাদের কথা খালাফরা সালাফ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যাদেরকে বিদআতে অভিযুক্ত করা হয়নি, কিংবা খারেজি,[৩৪] রাফেজি,[৩৫] মুতাজিলা,

---

৩৩. ইতিজালের ফিতনা বলতে মুতাজিলা ফিরকার ফিতনা উদ্দেশ্য। এর বিবরণ হলো, এটা ইসলামি ইতিহাসের উমাইয়া আমলে জন্ম নেওয়া একটি ভ্রান্ত গোষ্ঠীর নাম। এরা ওহির ওপর আকলের মর্যাদা দেয়। এরা ঈমান ও কুফরের মাঝখানে মানুষের আরও একটি অবস্থান দাবি করে। তারা মনে করে, বান্দার কর্ম বান্দার নিজেরই সৃষ্টি, এখানে আল্লাহর কোনো হস্তক্ষেপ নেই। তারা আল্লাহর সিফাতগুলো বাতিল সাব্যস্ত করে। তারা আরও মনে করে, কবিরা গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন না। কবিরা গুনাহকারী নিশ্চিতভাবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে এবং সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল বিন আতা হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহর শিক্ষা মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে এই ফিরকাটিকে মুতাজিলা (বিচ্ছিন্ন) হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।

৩৪. ইসলামি ইতিহাসে ভ্রান্ত একটি গোষ্ঠীর নাম খারেজি। খারেজিদের মূল ভ্রান্তি হলো, তারা কবিরা গুনাহকারীকে কাফের মনে করে। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর জমানায় এই দলের উৎপত্তি হয়।

৩৫. রাফেজি শিয়াদেরই আরেক নাম। যারা হজরত আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার খেলাফতকে অস্বীকার করে এবং আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাসহ অধিকাংশ সাহাবিদের গালমন্দ করে ও কাফের বলে। তারা মনে করে, আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার বংশধররাই ছিলেন খেলাফতের একমাত্র হকদার ও উপযুক্ত। শায়খাইন তথা আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার

কাদরিয়া[৩৬], মুরজিয়া, জাহমিয়া, জাবরিয়া[৩৭] ও কাররামিয়ার[৩৮] মতো বাতিল উপাধিতে যারা প্রসিদ্ধি লাভ করেননি।'[৩৯]

সুতরাং যারা বিদআত বা উল্লিখিত কোনো বাতিল গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ততার ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তারা আমাদের জন্য অনুসরণীয় সালাফ নন। এজন্য উলামায়ে কেরাম এসব বাতিল গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কহীনতা বোঝাতে সালাফ শব্দের সাথে 'সালেহিন' শব্দটি যুক্ত করার কথা বলেছেন। সালাফে সালেহিন তথা উম্মাহর মহান নেককার পূর্বসূরি। কারণ এসব বাতিল গোষ্ঠী যুগ বা সময়ের বিচারে সালাফের সংজ্ঞায় ঢুকে এলেও আদর্শের বিচারে তারা সালাফদের দলভুক্ত হতে পারেনি। সালাফ শব্দের মর্ম কেবল জমানার ভেতরই সীমাবদ্ধ নয়। একটি প্রতিষ্ঠিত মানহাজ এই সালাফ শব্দের গভীরে অবস্থান করে। যার ফলে অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আক্ষরিক অর্থে সালাফ হওয়ার পরেও তারা সালাফে সালেহিন নয়।

হাদিস শরিফে এসেছে, মুসলিম উম্মাহর ভেতর বিভিন্ন ভ্রান্ত ফিরকার আবির্ভাব হবে। এই ভ্রান্ত ফিরকাগুলোর মধ্য থেকে হকপন্থিদের পৃথক করার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মানদণ্ড দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমার ও আমার সাহাবিদের পথে যারা চলবে, তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল।'[৪০]

খেলাফতকে অস্বীকার (রাফজ) করার কারণে এদেরকে রাফেজি বলা হয়। কারণ আরবিতে এর শাব্দিক অর্থ অস্বীকারকারী।

৩৬. কাদরিয়া বলা হয়, যারা মূলত কদরকে অস্বীকার করে। অর্থাৎ তারা মনে করে মানুষের কাজকর্মে আল্লাহর কোনো হস্তক্ষেপ নেই। মানুষ নিজেই তার কাজের স্রষ্টা। এরা জাবরিয়া সম্প্রদায়ের বিপরীত গোষ্ঠী।

৩৭. জাবরিয়া ফিরকা বান্দার কর্মের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে। তারা দাবি করে, বান্দার সকল কর্ম যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, তাই বান্দার সকল কর্মই আল্লাহর কর্ম। এজন্য তারা বিশ্বাস করে, বান্দা কুফর করুক কিংবা শিরক, সকল কাজের দায়ভার আল্লাহর। বান্দা কোনো কর্মের জন্য বিচারের সম্মুখীন হবে না।

৩৮. কাররামিয়া গোষ্ঠীকে মুশাব্বিহাও বলা হয়। এই দলের মূল ভ্রান্ত বিশ্বাস হলো, তারা আল্লাহর গুণাবলিকে মানুষের গুণাবলির সদৃশ বলে দাবি করে।

৩৯. লাওয়ামিউল আনওয়ার, ১/২০

৪০. সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ২৬৪১, হাদিসটির সনদ হাসান পর্যায়ের। ইমাম তিরমিজি রহিমাহুল্লাহ এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে বলেন,
هذا حديث مفسّر حسن غريب لا نعرف مثل هذا إلاّ من هذا الوجه.

এই হাদিস থেকেও আমরা সালাফে সালেহিনের একটি আদর্শগত সংজ্ঞা লাভ করতে পারি। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িগণ সাহাবিদের কাছাকাছি পর্যায়েই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বাণীর মর্মের ইলম অর্জন করেছেন। কারণ তারা সাহাবায়ে কেরামের ছাত্র। সাহাবিদের হাতেই তাদের ইলমের ভিত্তি গড়ে উঠেছে। তারা সকলেই সাহাবিদের মতামতের অনুসরণ করা, তাদের বক্তব্য গ্রহণ করা এবং তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফতোয়া প্রদানের ব্যাপারে একমত ছিলেন। এ ব্যাপারে তাদের কারও দ্বিমত বা অস্বীকৃতি ছিল না।[৪১]

ইমাম শাতেবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তাবেয়িরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাহাবিদের পুরো জীবনযাপনকে কর্তব্যরূপে গ্রহণ করেছেন। যার ফলে তারা দীনের গভীর বুঝ লাভ করেছেন এবং উলুমে শরিয়ায় পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করেছেন।'[৪২]

সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের পথের অনুসারী তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িরা হলেন কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুসলিমদের জন্য সালাফ। আবার এই তিন প্রজন্মের অনুসরণকারী প্রত্যেক পূর্ববর্তী আলেমে দীন তার পরবর্তীদের জন্য সালাফ। আমরা যদি এই মৌলিক বিষয়টি ভালো করে বুঝতে পারি, তাহলে দীনে ইসলামের জ্ঞানতাত্ত্বিক যে সিলসিলা বা ক্রমধারাটা আছে, তা সহজেই আয়ত্ত করতে পারব। সাথে সাথে বুঝতে পারব এই ক্রমধারার গুরুত্ব ও যথার্থতা।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমরা কখনোই আমাদের খালাফদের সিলসিলা ছাড়া সালাফ পর্যন্ত পৌঁছতে পারব না। খালাফরা সালাফদের সাথে আমাদের আদর্শিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যস্থতাকারী। সালাফ পর্যন্ত পৌঁছতে তারা আমাদের সিঁড়ি। এজন্য সালাফদের অনুসরণের নামে খালাফদের প্রতি বেপরোয়া হলে, প্রকৃতপক্ষে আমরা সালাফদের আদর্শ ধারণ করতে পারব না। তাদের পরবর্তী খালাফদের সিলসিলাই আমাদের পর্যন্ত সালাফে সালেহিনের আদর্শকে অবিকৃতভাবে নিয়ে এসেছে। তবে এই ক্ষেত্রেও আমাদেরকে মানদণ্ড ঠিক রাখতে হবে। সালাফ-পরবর্তী খালাফদের সিলসিলায় প্রত্যেকেই আমাদের

---

৪১. ইজমালুল ইসাবাহ ফি আকওয়ালিস সাহাবাহ, পৃষ্ঠা ৬৬, মুহাম্মাদ সুলাইমান আল আশকারের তাহকিককৃত নুসখা।

৪২. আল মুওয়াফাকাত, ১/৯৫

জন্য অনুসরণীয় নন; বরং এই সিলসিলায় যারা সালাফে সালেহিনের মানহাজের অনুসারী হিসেবে স্বীকৃত, তারাই আমাদের জন্য অনুসরণীয় খালাফ। অনুরূপ নির্দিষ্ট কোনো খালাফের সকল সিদ্ধান্ত বা মতই আমাদের জন্য সালাফের ফাহম ও রায় বোঝার সিঁড়ি নয়; বরং হতে পারে খালাফের কেউ নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে সালাফদের ফাহম ও মানহাজ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। তখন নির্দিষ্ট ওই বিষয়ে তিনি আমাদের জন্য সালাফ এবং আমাদের মাঝে ফাহম ও আদর্শের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বিবেচিত হবেন না।

উল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা সালাফ শব্দের জমানাগত ও আদর্শগত মর্ম বুঝতে পেরেছি। এই দুই মর্মের সমন্বয়ে আমরা সালাফে সালেহিনের আদর্শের প্রায়োগিক বা মাজহাবগত একটি মর্ম বের করতে পারি। সালাফে সালেহিন কুরআন, সুন্নাহ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিদের থেকে প্রাপ্ত ইলমের মাধ্যমে বিধানসমষ্টির যে কয়টি কাঠামো ও পথ তৈরি করেছেন, সেগুলো সালাফদের ফাহম ও মানহাজের প্রায়োগিক ও বাস্তবিক রূপ। যা ইসলামি জ্ঞানতত্ত্বে মাজহাব নামে পরিচিত। এজন্য আমরা দেখতে পাই—চার মাজহাবের ইমামগণ তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িদের জমানার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রে মাজহাবগুলো নিছক ইমামদের মতামতের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি; বরং ইমামরা তাবেয়ি কিংবা তাবে-তাবেয়ি হওয়ার সূত্রে সাহাবায়ে কেরাম থেকে কুরআন-সুন্নাহর যে ইলম ও ফাহম লাভ করেছেন, তার ভিত্তিতেই কুরআন-সুন্নাহর আহকাম ও মাসায়েল মুসলিমদের সামনে উন্মোচন করেছেন। আর এর মাধ্যমে তারা একদিকে হেফাজতে দীনের খোদাপ্রদত্ত ইজাজি (অলৌকিক) ইসনাদের অংশ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, অন্যদিকে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামি শরিয়াতের গতিশীলতার জন্য নিরাপদ প্রবাহ তৈরি করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পুরো মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

বর্তমানে যারা মাজহাবসমূহকে কুরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধে দাঁড় করাচ্ছে, এমনকি কেউ কেউ সাহাবায়ে কেরামের স্বীকৃত আমলও কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী হিসেবে প্রচার করছে, তারা যে নামই ধারণ করুক না কেন, নিঃসন্দেহে তারা সালাফে সালেহিনের ফাহম ও মানহাজ থেকে বিচ্যুত। নিশ্চয় ইসলামি শরিয়াহর প্রধান

উৎস কুরআন ও সুন্নাহ। মৌলিকভাবে আমরা কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের জন্যই আদিষ্ট। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহ কেবল লফজি বা শব্দগত বস্তু নয়; বরং এগুলোর মা'না (অর্থ) বা মাফহুম তথা মর্মগত ব্যাপার আছে। এখন নুসুসে শরিয়াহ থেকে মর্ম উদ্ধার করার ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থান বিচিত্র হবে। কারণ একেকজনের মেধা একেক রকম। আবার একেকজন একেক বহিরাগত চিন্তা ও আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। সে ক্ষেত্রে যদি নুসুসে শরিয়াহর ফাহমের মৌলিক একটি শাকল বা গঠন মানদণ্ড হিসেবে না থাকে, তাহলে কুরআন-সুন্নাহর মর্ম বিকৃত হতে হতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের মর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সালাফে সালেহিনের ফাহম ও মানহাজটাই হলো সেই মানদণ্ড ও কাঠামো।

এজন্য সালাফদের স্বীকৃত ও সামগ্রিক বুঝকে বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহ বোঝা ও আমল করার দাবি করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে মানুষকে গোমরাহ করবে। তার হাত দ্বারা ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রে ও মুসলিম-সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে। মুসলিম উম্মাহর চৌদ্দশ বছরের ইলমি ও আমলি তুরাসকে পাশ কেটে এবং সালাফে সালেহিনের বুঝকে উড়িয়ে দিয়ে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর ওপর আমলের দাবি ইলমি মুগালাতাহ (জ্ঞানগত বিভ্রান্তি) ছাড়া কিছুই না। কারণ কুরআন ও সুন্নাহ সরাসরি আমাদের ওপর অবতীর্ণ হয়নি। সালাফে সালেহিনের প্রথম প্রজন্মের সামনে নুসুসে শরিয়াহ অবতীর্ণ হয়েছে। তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নুসুসে শরিয়াহ তার মর্মসহ শিখে নিয়েছেন। সাহাবিদের থেকে শরিয়াহর নুসুস ও ফাহম আয়ত্ত করেছেন তাবেয়িরা, তাদের থেকে তাবে-তাবেয়িরা, এভাবেই প্রত্যেক প্রজন্মের সত্যনিষ্ঠ আহলে ইলমরা শরিয়াহর নুসুস ও ফাহমকে অবিকৃতভাবে ও সঠিক পথে প্রবাহিত করে আমাদের নিকট পৌঁছিয়েছেন। যা মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইসলামি শরিয়াহ সংরক্ষণ রাখার ওয়াদার বাস্তবায়ন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমিই এই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর রক্ষণাবেক্ষণকারী।'[৪৩]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা কুরআন সংরক্ষণের মাধ্যমে সুন্নাহ ও এতদুভয়ের মর্মের রক্ষণাবেক্ষণেরও ওয়াদা করেছেন। তাই কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রের এই সিলসিলা বহাল থাকবে। আর এই সিলসিলায় সালাফে সালেহিনের ফাহম

---

৪৩. সুরা হিজর, আয়াত ০৯

ও মানহাজ বিচারিক ক্ষমতা ও মানদণ্ডের অবস্থান চির স্বীকৃতির সাথে সংরক্ষণ করবে। যেন ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রে পবিত্র ও ইজাযি এই সিলসিলা ভুল ধারায় প্রবাহিত না হয় এবং এতে বিকৃতি, মিথ্যাচার ও মূর্খতা স্থান না পায়। মহান এই সিলসিলাকেই আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের পরিভাষা হিসেবে চিনি এবং ব্যক্ত করি।

ফাহমুস সালাফ দ্বারা উদ্দেশ্য

আমরা ইতঃপূর্বে ফাহম ও সালাফ এই দুই শব্দের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য পৃথকভাবে জেনে এসেছি। এই দুটি শব্দের সংজ্ঞা থেকেই আমাদের সামনে ফাহমুস সালাফ শব্দের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়। ফাহমুস সালাফ দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িরা নুসুসে শরিয়াহ থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্য হিসেবে যা বুঝেছেন এবং উন্মোচন করেছেন। এই সংজ্ঞায় কোনো নসের ফাহমের ওপর তাদের ইজমা বা জমহুরের অবস্থান অন্তর্ভুক্ত। পাশাপাশি এককভাবে সেই ফাহমও অন্তর্ভুক্ত, যা প্রচার ও বিস্তার লাভ করা সত্ত্বেও সালাফদের কারও বিরোধিতা কিংবা সে ব্যাপারে তাদের কারও বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায় না। এজন্যই ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িরা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে যা বুঝেছেন, পরবর্তীদের বুঝের দিকে ফেরার চেয়ে তার দিকেই ফেরা উত্তম।[৪৪]

পাশাপাশি সালাফে সালেহিনের মৌলিক এই বুঝকে ভিত্তি করে খালাফরা (পরবর্তীরা) তাওয়ারুস (পরম্পরা) সূত্রে যে ফিকহি তুরাস (ঐতিহ্য) গড়ে তুলেছেন, মানহাজগতভাবে সেটিও আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং ফাহমুস সালাফ ও এর প্রামাণিকতার ভেতর আমরা দুটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

এক. দীনি বিষয়ে সালাফদের ইলমি ও আমলি মাসায়েল। যেগুলো সালাফরা নুসুসে শরিয়াহ থেকে বুঝেছেন, আমল করেছেন এবং স্বীকৃতি দিয়েছেন।

---

৪৪. ইলামুল মুয়াক্কিয়িন, ৪/১১৮

দুই. সালাফদের ইলম শেখার মানহাজ, দলিল প্রদানের উসলুব (পদ্ধতি) এবং ইজতিহাদি ও ইখতিলাফি বিষয়ে তাদের আচরণবিধি।

প্রথমটা ফাহমুস সালাফের প্রায়োগিক রূপ, আর দ্বিতীয়টা তাদের মানহাজগত রূপ। সাধারণ ফিকহ, তাফসির ও হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোর মাধ্যমে আমরা প্রথম প্রকারের সাথে পরিচিত হতে পারব। উসুলে ফিকহ, উসুলে তাফসির ও উসুলে হাদিসের কিতাবাদির মাধ্যমে আমরা দ্বিতীয় প্রকারের সাথে পরিচিত হতে পারব। এই বইয়ে আমরা ফাহমুস সালাফ দ্বারা এই উভয় প্রকারই উদ্দেশ্য নিয়েছি।

ফাহমুস সালাফের প্রতি গুরুত্বারোপের কারণ

মহান আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহি নাজিল করেছেন এবং রাসুলকে সেই ওহির ব্যাখ্যা উম্মতকে শিখিয়ে দিতে বলেছেন। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

بِالْبَيِّنٰتِ وَ الزُّبُرِ ؕ وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

'সে রাসুলদেরকে উজ্জ্বল নিদর্শন ও আসমানি কিতাব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। (হে নবি!) আমি তোমার প্রতিও এই কিতাব নাজিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের সামনে সেই সব বিষয়ের ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা করে।'[৪৫]

এর থেকে বোঝা যায়, মুসলিম উম্মাহ ওহি ও তার ব্যাখ্যা উভয়টারই মুখাপেক্ষী। ফলে মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামকে ওহি ও তার ব্যাখ্যার প্রায়োগিক রূপ শিখিয়ে দিয়েছেন। যেন কিয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মতের কাছে তাওয়ারুস সূত্রে ওহি ও তার বুঝ পৌঁছে যায়। আর এই ক্ষেত্রে তিনি আমাদের আদর্শ হিসেবে উম্মতের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম সাহাবায়ে কেরামকে প্রস্তুত করেছেন। এইজন্য নুসুসে শরিয়াহ বোঝার ক্ষেত্রে তাদেরকেই আমাদের আদর্শ ও মানদণ্ড মানতে হবে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের প্রতিটি ধারাই এ

৪৫. সুরা নাহল, আয়াত ৪৪

ব্যাপারে একমত। এজন্য উম্মাহর মাঝে স্বীকৃত প্রত্যেক ইমাম, ফকিহ, মুহাদ্দিস ও আলেম পরবর্তী প্রজন্মকে সালাফদের ইলম, আমল ও নুসুসের ক্ষেত্রে তাদের ফাহমের দিকে ফেরার জন্য গুরুত্বারোপ করেছেন। তাদের এই গুরুত্বারোপের পেছনে শরয়ি দলিল ছাড়াও যৌক্তিক অনেক কারণ আছে। যেমন :

১. সালাফদের দীন গ্রহণের উৎসের বিশুদ্ধতা

তারা এই দীনকে সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ ঈমান ও আত্মসমর্পণের সাথে গ্রহণ করেছেন। দীনে ইসলামের ওপর বহিরাগত কোনো কিছুকে তারা বিচারক মানেননি এবং বানাননি। আল্লামা লালকায়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সাহাবায়ে কেরাম ইসলামকে সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। তৃতীয় কোনো মাধ্যম ছাড়াই শরিয়াতের বিধানসমূহ রপ্ত করেছেন। অতঃপর সেগুলো মৌখিকভাবে সংরক্ষণ করেছেন এবং অন্তরে একনিষ্ঠভাবে সত্য হিসেবে বিশ্বাস করে নিয়েছেন। ইসলাম এমনই এক দীন, যার প্রথম সারির মনীষীরা রাসুলের কাছ থেকে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা ও কপটতা ব্যতিরেকেই সরাসরি তাকে আত্মস্থ করেছেন। তারপর ন্যায়পরায়ণ মানুষেরা তাদের পরবর্তী ন্যায়পরায়ণ মানুষের কাছে এই দীন পৌঁছে দিয়েছেন। এই দীন বয়ান ও বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তারা কোনো পক্ষের চাপ কিংবা কোনো পক্ষের প্রতি ঝোঁকের শিকার ছিলেন না। এভাবেই জামাতের পর জামাত পরম্পরাভাবে এই দীন গ্রহণ করে আসছেন।[৪৬]

বহিরাগত কোনো সংশয়-আপত্তি সাহাবিদের দীনের বুঝকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তাদের বিশুদ্ধ বুঝের ওপর বহিরাগত কোনো উপাদানের প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা দেখলেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তাদেরকে রক্ষা করেছেন। একবার উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাতে তিনি তাওরাতের একটি কপি দেখে ধমক দেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের কাছে স্বচ্ছ শুভ্র দীন নিয়ে আসিনি?'[৪৭]

---

৪৬. শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআতি, ১/২২-২৩

৪৭. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১৫১৫৬; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদিস নং ৮০৮, শায়খ আলবানি হাসিটিকে হাসান বলেছেন। (ইরওয়াউল গলিল, হাদিস নং ১৫৮১)

রাসুলের এই তারবিয়ত সাহাবায়ে কেরাম তাবেয়িদের মাঝেও বাস্তবায়ন করেছেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'হে মুসলিম জাতি! তোমরা কীভাবে আহলে কিতাবদের কোনো কিছুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো? অথচ তোমাদের সামনে রয়েছে সেই কিতাব, যা আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবির ওপর অবতীর্ণ করেছেন, যেটি আল্লাহর সম্পর্কে নবতর তথ্য সংবলিত। তোমরা যা তিলাওয়াত করো এবং যার মধ্যে কোনোরূপ মিথ্যার সংমিশ্রণ নেই। আর আল্লাহ তোমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, আহলে কিতাবরা আল্লাহর লেখাকে পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং নিজ হাতে সেই কিতাবের বিকৃতি সাধন করেছে।'[৪৮]

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে এক ব্যক্তি শাম থেকে একটি বই নিয়ে এল। তিনি বইটি দেখে সরাতে বললেন এবং পানি চাইলেন। অতঃপর পানি দিয়ে বইটিকে ভিজিয়ে দিলেন (নষ্ট করে দিলেন) এবং বললেন, 'তোমাদের পূর্বের জাতিরা এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, তারা তাদের নিজস্ব কিতাব ছেড়ে বহিরাগত বিভিন্ন গ্রন্থের অনুসরণ করত।'[৪৯]

২. শরিয়াতের নুসুস বোঝার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত বিশুদ্ধতা এবং যেকোনো অস্পষ্টতা স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সমাধা করিয়ে নেওয়া

মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা যথাযথভাবে উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এমন কোনো কল্যাণ নেই, যার সন্ধান তিনি উম্মতকে দিয়ে যাননি এবং এমন কোনো অকল্যাণ নেই, যার ব্যাপারে তিনি উম্মতকে সতর্ক করেননি। হাদিস শরিফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'পূর্ববর্তী সকল নবিদেরই দায়িত্ব ছিল স্বীয় উম্মতকে তার জানা সকল কল্যাণের ব্যাপারে অবহিত করা এবং সকল অকল্যাণের ব্যাপারে সাবধান করা।'[৫০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গতার সাথে পালন

---

৪৮. বুখারি, কিতাবুত তাওহিদ, হাদিস নং ৭৫২৭

৪৯. সুনানুদ দারেমি, মুকাদ্দিমাহ, হাদিস নং ৪৯৪

৫০. সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, হাদিস নং ১৮৪৪

করেছেন। আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন অবস্থায় রেখে গেছেন যে, আসমানে একটি পাখির ডানা নাড়ানোর সংবাদ পর্যন্ত তিনি আমাদের জানিয়ে গেছেন।'[৫১] (এখানে কথাটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। পাখির ডানা নাড়ানোর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, তিনি জীবন পরিচালনার জন্য পূর্ণাঙ্গ একটি দীন আমাদের দিয়ে গেছেন, যেখানে কোনো শূন্যতা ও অপূর্ণতা নেই।)

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমাদের মাঝে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন। অতঃপর সৃষ্টির সূচনা থেকে জান্নাতিদের জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নামিদের জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত সবকিছু আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন। (এসব বিষয়) যারা সংরক্ষণ করার, তারা সংরক্ষণ করে নিল। আর যারা ভোলার, তারা ভুলে গেল।[৫২]

এভাবেই সাহাবায়ে কেরাম রাসুলের কাছ থেকে দীন আহরণ করেছেন, নিজেদের বুঝকে বিশুদ্ধ করে নিয়েছেন। যখনই কোনো বিষয়ে অস্পষ্টতা তৈরি হতো, তখনই তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিংবা যে জানত তাকে জিজ্ঞেস করে পরিষ্কার করে নিতেন। কুরআন-সুন্নাহ বোঝার প্রতি তাদের মতো আগ্রহী কেউ ছিল না। এই আগ্রহের ফলে আল্লাহর রাসুলের রেখে যাওয়া এমন কোনো ইলম ছিল না, যা তারা আয়ত্ত ও সংরক্ষণ করেননি।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'সেই সত্তার শপথ যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই! আল্লাহর কিতাবে যে সুরাই অবতীর্ণ হয়েছে, আমি জানি সেটা কোথায় এবং কোন বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। যদি আমি আমি জানতে পারি আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে আমার থেকেও বেশি ইলমসম্পন্ন ব্যক্তি আছেন, যার কাছে উটে চড়ে বহুদূর পথ পাড়ি দিয়ে যেতে হবে, তবে আমি তার কাছেও যাব।'[৫৩]

ইবনু আবি মুলাইকাহ হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর ব্যাপারে বলেন,

---

৫১. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২১৩৬১, শায়খ আরনাউত বর্ণনাটিকে হাসান বলেছেন।

৫২. সহিহ বুখারি, কিতাবু বাদইল খালক, হাদিস নং ৩১৯২; সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ফিতান, হাদিস নং ২৮৯২

৫৩. সহিহ বুখারি, ফাজায়িলুল কুরআন, হাদিস নং ৫০০২; সহিহ মুসলিম, ফাজায়িলুস সাহাবাহ, হাদিস নং ২৪৬২

'যদি তিনি এমন কিছু শুনতেন যা জানতেন না, তাহলে সে বিষয়টি না জানা পর্যন্ত তিনি পুনরাবৃত্তি করতেই থাকতেন। অর্থাৎ যে জানত তার কাছে জিজ্ঞেস করতেই থাকতেন।'[৫৪]

ইমাম মালেক স্বীয় মুআত্তায় বর্ণনা করেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আট বছর সময় লাগিয়ে কেবল সুরা বাকারা শিখেছেন।'[৫৫]

এখানে সুরা বাকারা শেখার দ্বারা উদ্দেশ্য তিলাওয়াত শেখা কিংবা শব্দ মুখস্থ করা নয়; বরং প্রতিটি আয়াতের মর্ম, বুঝ, ফিকহ ইত্যাদি আয়ত্ত করা। এজন্যই ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সাহাবায়ে কেরাম কুরআনের শব্দ যেভাবে সংরক্ষণ করেছেন, তার থেকে বেশি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছেন কুরআনের বুঝ। এরপর তারা কুরআনের শব্দাবলির মতো কুরআনের স্বচ্ছ বুঝকেও তাবেয়িদের কাছে পূর্ণাঙ্গরূপে পৌঁছে দিয়েছেন।'[৫৬]

এই অবস্থা কেবল সাহাবিদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং উম্মাহর শ্রেষ্ঠযুগের তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িগণের অবস্থাও এমন ছিল। মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি পবিত্র কুরআনকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিন বার ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কাছে উপস্থাপন করেছি। প্রতিবারই প্রত্যেকটি আয়াতের শেষে আমি থেমেছি এবং তার কাছে এর মর্ম ও ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করে নিয়েছি।[৫৭]

৩. অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত যেকোনো ভ্রান্ত বিশ্বাস ও প্রবণতা থেকে তাদের ফিতরাতের পবিত্রতা

ইসলামি নুসুস বোঝার ক্ষেত্রে ফিতরাত[৫৮] অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাপ ও

---

৫৪. সহিহ বুখারি, কিতাবুল ইলম, হাদিস নং ১০৩

৫৫. মুআত্তা মালিক, কিতাবুল কুরআন, হাদিস নং ৪৭৯

৫৬. মাজমুউল ফাতাওয়া, ১৭/৩৫৩

৫৭. তাফসিরে তাবারি, ২/৫২৪

৫৮. মানুষ যে সহজাত যোগ্যতা, শক্তি ও গুণাবলি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, তাকেই ফিতরাত বলা হয়। প্রত্যেক মানুষই আল্লাহকে চেনার, সত্য গ্রহণের এবং সঠিক দীন উপলব্ধি করার যোগ্যতা ও মানসিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারপর সে যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে এবং আশপাশ থেকে যে শিক্ষাদীক্ষা পায়, সে অনুযায়ীই তার চিন্তাভাবনা গড়ে ওঠে।

কুফরের পরিবেশে থাকতে থাকতে বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিমের ফিতরাত নষ্ট হয়ে গেছে। সাহাবিদের বুঝ অধিকতর বিশুদ্ধ হওয়ার একটি কারণ তাদের ফিতরাতের পবিত্রতা। ফিতরাতকে নষ্ট করতে পারে এমন যেকোনো প্রকার পরিবেশ ও উপাদান থেকে তারা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতেন। ফলে শরয়ি নুসুসই ছিল তাদের চিন্তাচেতনায় একমাত্র প্রভাব বিস্তারকারী এবং তাদের কর্মের একমাত্র বিচারক।

সালাফে সালেহিনের জমানায় দীনে ইসলাম ছিল বিজয়ী সভ্যতা। মুসলিম সমাজে মৌলিকভাবে আহকামে শরিয়াহ প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত ছিল। ইসলামের বিজয়ধারা ছিল অব্যাহত। ইসলাম ও মুসলিমদের ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা বহিরাগত কোনো সভ্যতার ছিল না। ইখলাস ও তাকওয়ার উচ্চ আসনে থাকার পাশাপাশি দীনের বুঝ লাভ ও বিধান উদঘাটনের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপ ও প্রভাবমুক্ত। তাদের এই স্বচ্ছ ও শুভ্র অবস্থান পরবর্তীদের জন্য এক বিরল বিষয়। বিশেষত বর্তমান মুসলিমদের ক্ষেত্রে এটি কল্পনাতীত বিষয়। সর্বত্র আজ ইউরোপীয় সভ্যতার জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মুসলিমদের মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলো আজ ভিন্ন সভ্যতার উপনিবেশে পরিণত হয়ে আছে। যা দীনের সঠিক বুঝ লাভের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি বাধা।

৪. ইলম অনুযায়ী আমল করার প্রতি তাদের প্রবল আগ্রহ

ইলমের প্রধান মাকসাদই হলো ইলম অনুযায়ী আমল করা। আর শরয়ি নুসুসের বুঝ ছাড়া আমল করা যায় না। ইলম অনুযায়ী আমল শরিয়াতের বুঝকে আরও শক্তিশালী ও জীবন্ত করে। সাহাবিদের আমলের সাক্ষ্য স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমার পূর্বে আল্লাহ যত নবি পাঠিয়েছেন, তাদের সকলেরই নিজ উম্মতের ভেতর থেকে কিছু ঘনিষ্ঠ সহচর ছিল, যারা সেই নবির সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তার নির্দেশ পালন করত। এরপর তাদের এমন কিছু উত্তরসূরির আগমন ঘটত, যারা যা বলত তা করত না। আর যা করত তার ব্যাপারে তারা নির্দেশিত ছিল না।'[৫৯]

---

৫৯. সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদিস নং ৫০

আবু আবদুর রহমান আস সুলামি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'যারা আমাদের কুরআন শিক্ষা দিতেন, যেমন উসমান বিন আফফান, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা প্রমুখরা যখন ১০টি আয়াত শিখতেন, তখন সেই ১০ আয়াতের ব্যাপারে ইলম অর্জন ও সে অনুযায়ী আমল করা ছাড়া সামনে অগ্রসর হতেন না। ফলে তারা বলতেন, "আমরা কুরআনের আয়াত, ইলম ও আমল সবকিছু একসাথে শিখেছি।"[৬০]

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমাদের ভেতর কেউ ১০ আয়াত শেখার পর তার মর্ম জানা এবং সেই অনুযায়ী আমল করা ছাড়া সামনে অগ্রসর হতো না।'[৬১]

এজন্যই সাহাবিদের আমল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিকট শরয়ি দলিল। নুসুস বোঝার ক্ষেত্রে মতভিন্নতা দেখা দিলে সাহাবিদের আমল মতভিন্নতা দূরকারী হিসেবে স্বীকৃত বিষয়। আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কোনো হাদিসের ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিলে সাহাবিদের আমলের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।'[৬২]

কারণ, হয়তো তাদের আমল তিনটি বিষয়ের কোনো একটি হবে।

এক. তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমনটি শুনেছেন।

দুই. নতুবা যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছে, তার থেকে শুনেছেন।

তিন. অথবা তারা নস থেকে এমনটি বুঝেছেন। আর তাদের বুঝই সত্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী ও বিশুদ্ধ।

ওপরের কথা থেকে বোঝা যায় যে, কোনো নসের বুঝ ও ব্যাখ্যা হিসেবে সাহাবিদের থেকে আকিদা ইত্যাদি বিষয়ক যেসব বক্তব্য আমাদের কাছে এসেছে, সেগুলো সুন্নাহর মর্যাদা রাখে। এগুলো সাহাবিদের ইজতিহাদি সিদ্ধান্ত নয়। এজন্য মুহাদ্দিসিনে কেরাম সাহাবিদের এই প্রকার আকওয়াল (বক্তব্য) ও আসারের (বর্ণনা) ওপর মারফু হাদিসের হুকুম দিয়ে থাকেন।[৬৩]

---

৬০. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, হাদিস নং ৯৯৭৮; তাফসিরে তাবারি, ১/৮০

৬১. তাফসিরে তাবারি, ১/৪৪

৬২. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৭২০

৬৩. তাদরিবুর রাবি, ইমাম সুয়ুতি, ১/১৯০-১৯৩

ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমরা জানি সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িরা এই কুরআনকে গভীরভাবে পাঠ করেছেন। কুরআনের তাফসির ও মর্মের ব্যাপারে তারাই সবচেয়ে বেশি অবগত। অনুরূপ আল্লাহ তাআলা তার রাসুলকে যে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, সে সত্যের ব্যাপারেও তারা উম্মতের সবার থেকে বেশি ইলম রাখেন। সুতরাং যে তাদের সাথে সাংঘর্ষিক বক্তব্য দেবে, তাদের তাফসিরের খেলাফ তাফসির প্রদান করবে, নিশ্চিতভাবে সে দলিল ও মাদলুল (যার ওপর বা যে ব্যাপারে দলিল প্রদান করা হয়) উভয় ক্ষেত্রেই ভুল করবে।'[৬৪]

শরয়ি নুসুসের বিশুদ্ধ ফাহমের ক্ষেত্রে সালাফদের বুঝ হলো মানদণ্ড, বিশেষ করে মাসায়েলের ক্ষেত্রে। শরিয়াতের নুসুসের ক্ষেত্রে বর্তমানের সকলের ফাহমকেই সালাফদের বুঝের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। যদি তা সালাফদের ফাহমের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়, তাহলে সেই বুঝ গ্রহণযোগ্য। আর যদি সালাফদের ফাহমের বিরোধী হয়, তাহলে সেই বুঝ ভ্রান্ত ও পরিত্যাজ্য। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَاۤ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِیْ شِقَاقٍ ۚ فَسَیَكْفِیْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ.

'অতঃপর তারাও যদি সে রকম ঈমান আনে যেমন তোমরা ঈমান এনেছ, তবে তারা সঠিক পথ পেয়ে যাবে। আর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা মূলত শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদের সাহায্যার্থে তাদের দেখে নেবেন এবং তিনি সকল কথা শোনেন ও সবকিছু জানেন।'[৬৫]

যে ব্যক্তি সালাফদের কোনো প্রজন্মের মাঝে ছিদ্রান্বেষণ করে, ইসলাম বোঝার আদর্শ হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা ও অবস্থার ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করে, সে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ব্যাপারেই সন্দেহ সৃষ্টি করছে এবং রাসুলের দীন পৌঁছানোর দায়িত্বে ছিদ্রান্বেষণ করছে। এমনকি সালাফদের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে

৬৪. মুকাদ্দিমাতুন ফি উসুলিত তাফসির লি ইবনি তাইমিয়া, পৃষ্ঠা ৯১
৬৫. সুরা বাকারা, আয়াত ১৩৭

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যে সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন, সে সার্টিফিকেটকেই সে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। মোটকথা সে জেনে কিংবা না জেনে ইসলামি শরিয়াহর ফাউন্ডেশনকেই আঘাত করছে। আল্লাহ আমাদেরকে এই জঘন্য কাজ থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

৫. সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক ওহির অবতরণ এবং তার প্রেক্ষাপটকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করা

এই বিষয়টি শরয়ি নুসুসের ক্ষেত্রে তাদের বুঝকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে এবং এই বিষয়টির ক্ষেত্রে অন্য কোনো জমানার লোক তাদের অংশীদার হওয়াও সম্ভব নয়। আর সাহাবায়ে কেরাম থেকে এই বুঝ অর্জন করেছেন তাদের ছাত্র তাবেয়িরা ও তাবেয়িদের থেকে তাদের ছাত্র তাবে-তাবেয়িরা। এই তিন যুগকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করে গেছেন।

পূর্বে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বক্তব্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, 'প্রত্যেক আয়াত কেন এবং কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে তিনি তা জানেন।' একইভাবে হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তোমরা আমাকে আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো। আমি আল্লাহর কিতাবের প্রতিটি আয়াত সম্পর্কে জানি— তা কি রাতে অবতীর্ণ হয়েছে না দিনে, সমুদ্র-তীরে অবতীর্ণ হয়েছে না পাহাড়ে।'[৬৬]

ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'নুসুসে কুরআনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের এমন অনন্য ফাহম অর্জিত আছে, যা পরবর্তীদের জন্য অর্জন করা সম্ভব ছিল না। এমনিভাবে রাসুলের সুনান ও আহওয়ালের (অবস্থা) ব্যাপারে তাদের এমন ইলম আছে, যা পরবর্তী অধিকাংশের কাছে জানা সম্ভব ছিল না। কারণ তারা সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম ও ওহির অবতরণকে দেখেছেন। সর্বক্ষণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজেদের দৃষ্টির সামনে রেখেছেন এবং তাঁর কথা, কাজ, অবস্থাকে কাছ থেকে জেনেছেন। যার

---

৬৬. তারিখে দিমাশক, ৪২/৩৯৮; তবাকাতু ইবনে সাদ, ২/৩৩৮

ভিত্তিতে সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের ফাহমের ওপর দলিল প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর এই বিষয়গুলো পরবর্তীদের জন্য সরাসরি জানা সম্ভব না। ফলে তারা সাহাবিদের ইজমা অথবা কিয়াসের ভিত্তিতে বিধান গ্রহণ করেছেন।'[৬৭]

আল্লামা শাতেবি রহিমাহুল্লাহ সাহাবিদের বুঝের ওপর নির্ভরতার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, দ্বিতীয়ত সাহাবায়ে কেরাম ওহি তথা কুরআন-সুন্নাহর অবতরণ এবং তার বাস্তব প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তারা ওহির পারিপার্শ্বিক অবস্থা বোঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং শানে নুযুলের ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো অবগত। এজন্য তারা এমন কিছু বুঝতে সক্ষম, যা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব না। তা ছাড়া উপস্থিত ব্যক্তি যা দেখে, অনুপস্থিত ব্যক্তি তা দেখে না। সুতরাং যখন সাহাবায়ে কেরাম থেকে কোনো মুতলাককে (সাধারণ বিধান) তাকয়িদ (শর্তযুক্ত) করার কিংবা কোনো আম[৬৮] বর্ণনাকে খাস[৬৯] করার বিবরণ পাওয়া যাবে, তখন এর ওপর আমল করাই সঠিক। আর এই কথা তখন প্রযোজ্য হবে, যখন এর বিরোধী কোনো বক্তব্য তাদের থেকে না পাওয়া যাবে। যদি কোনো সাহাবি উক্ত বর্ণনার বিরোধিতা করেন, তাহলে সেটি তার ইজতিহাদি বিষয় বলে গণ্য হবে।[৭০]

সুতরাং উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যটি শরয়ি টেক্সট বোঝার ক্ষেত্রে তাদের ওপর নির্ভরতাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। কারণ এটি এমনই এক বৈশিষ্ট্য, যা সাহাবায়ে কেরাম ছাড়া অন্য কারও নেই। নিম্নে দুটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো। যার থেকে সাহাবায়ে কেরামের ফাহমের গুরুত্ব পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

এক. কুসতানতিনিয়ার যুদ্ধে যখন মুসলিমরা জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহাদাত বরণ করছিল, তখন এক লোক বলে উঠল, এই লোকেরা কী করছে! নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অথচ মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

---

৬৭. মাজমুউল ফাতাওয়া, ১৯/২০০

৬৮. আম -এর শাব্দিক অর্থ ব্যাপক। পারিভাষিকভাবে আম বলা হয়, যে শব্দটি কোনো প্রকার সংখ্যা, ধরন ও অবস্থার সীমাবদ্ধতা ছাড়াই অনেক সংখ্যক সদস্যকে শামিল করে নেয়।

৬৯. খাস -এর শাব্দিক অর্থ নির্দিষ্ট। পারিভাষিকভাবে খাস বলা হয়, যে শব্দটি এককভাবে নির্দিষ্ট ধরন, নির্দিষ্ট অবস্থা ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যকে বুঝিয়ে থাকে।

৭০. আল মুওয়াফাকাত, ৪/১২৮

وَ اَنۡفِقُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ وَ لَا تُلۡقُوۡا بِاَیۡدِیۡکُمۡ اِلَی التَّہۡلُکَۃِ ۚۖۛ وَ اَحۡسِنُوۡا ۚۛ اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الۡمُحۡسِنِیۡنَ.

'আর আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করো এবং নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। এবং সৎকর্ম অবলম্বন করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।'[৭১]

সাহাবি আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু তার এই কথা শুনে বললেন, এই আয়াত আমাদের মাঝে অবতীর্ণ হয়েছে, আমি এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছি। আয়াতে নিজের জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো, জিহাদ ছেড়ে দিয়ে সম্পদ বৃদ্ধিতে মগ্ন হয়ে যাওয়া।[৭২]

দুই. এরকম আরও একটি উদাহরণ হলো, হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক উরওয়া রহিমাহুল্লাহ এর বুঝকে সংশোধন করে দেওয়া। উরওয়া রহিমাহুল্লাহ সুরা বাকারার ১৫৮ নং আয়াত থেকে বুঝেছিলেন যে, সাফা মারওয়া তাওয়াফ না করলে কোনো সমস্যা নেই। হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার এই বুঝকে সংশোধন করে দিয়ে বলেন, 'এই আয়াত সেসব আনসারদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা সাফা মারওয়া তাওয়াফ করাকে সমস্যা মনে করত। কারণ জাহেলি যুগে তারা তাদের দেবতাকে তাওয়াফ করত। ফলে তারা এই ব্যাপারে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে। তখন আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।'

এ ধরনের আরও অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেগুলোতে সাহাবায়ে কেরামের ফাহমের বিশুদ্ধতা ও গুরুত্ব ফুটে ওঠে।

৬. কুরআনের ভাষা তথা আরবি ভাষা সম্পর্কে তারাই সবচেয়ে জ্ঞাত

কারণ কুরআন তাদের ভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং আরবি ভাষা-সংক্রান্ত শাস্ত্রগুলো পরবর্তীতে তাদের ভাষা অনুযায়ীই গঠিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

---

৭১. সুরা বাকারা, আয়াত ১৯৫

৭২. আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, হাদিস নং ১৮৬৫৯

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ.

'নাজিল হয়েছে এমন আরবি ভাষায়, যা বাণীকে সুস্পষ্ট করে দেয়।'[৭৩] প্রথম জমানার লোকদের থেকে বিশুদ্ধভাষী এবং শক্তিশালী বাগ্মী ব্যক্তি পরবর্তী জমানার কেউ না। আল্লামা শাতেবি রহিমাহুল্লাহ অন্য সকলের বুঝের ওপর তাদের বুঝকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'আরবি ভাষা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান। তারা ছিলেন বিশুদ্ধভাষী আরব, তাদের ভাষায় কোনো পরিবর্তন ঘটেনি এবং আরবিতে তাদের বিশুদ্ধতার মাত্রা বিন্দুমাত্র কমেনি। সুতরাং অন্য যে কারও তুলনায় তারাই কুরআন-সুন্নাহ বোঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যোগ্য। যখন তাদের থেকে কোনো বক্তব্য কিংবা বক্তব্যের সমতুল্য কোনো কাজ আমাদের নিকট বিশুদ্ধ সনদে পৌঁছবে, তখন তার ওপর নির্ভর করাই সঠিক।'[৭৪]

তিনি আরও বলেন, 'কুরআনের ব্যাপারে সালাফে সালেহিনের যে বুঝসমূহ বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলোই আরবি ভাষার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ এবং শরয়ি দলিল সবগুলোর ওপর প্রমাণ বহন করে।'[৭৫]

আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আরবি ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতা শরয়ি নুসুস বোঝার ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হওয়ার অন্যতম একটি কারণ। ইমাম হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বিদআতিদের সম্পর্কে বলেন, 'অনারবতা তথা আরবির সাথে সম্পর্কহীনতাই তাদেরকে ধ্বংস করেছে।'[৭৬]

ইমাম শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন, '(দীনের ব্যাপারে) মানুষের অজ্ঞতা ও বিরোধের অন্যতম একটি কারণ হলো, আরবিকে বর্জন করা এবং এরিস্টটলের ভাষার দিকে ঝুঁকে পড়া।'[৭৭]

আল্লামা সুয়ুতি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইমাম শাফেয়ি যে বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, আমি তার আগের সালাফদেরও সে বিষয়ে সতর্ক করতে দেখেছি যে, বিদআতের অন্যতম একটি কারণ হলো, আরবি ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতা।'[৭৮]

---

৭৩. সুরা শুআরা, আয়াত ১৯৫

৭৪. আল মুওয়াফাকাত, ৪/১২৮

৭৫. প্রাগুক্ত, ৪/২৫৩

৭৬. আত তারিখুল কাবির লিল বুখারি, ৫/৯৩

৭৭. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১০/৮৪

৭৮. সওতুল মানতিক, পৃষ্ঠা ২২

সালাফদের বুঝকে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে যুগে যুগে আলেমদের যত্নশীলতা

দীনকে সঠিকভাবে বোঝার ক্ষেত্রে সালাফে সালেহিনের ফাহমের গুরুত্ব অপরিসীম হওয়ার কারণে উলামায়ে কেরাম যুগে যুগে প্রজন্ম পরম্পরায় তাদের ফাহমকে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করেছেন। এর ভিত্তিতেই তারা নিজেদের বুঝকে মেপে দেখেছেন ও প্রসারিত করেছেন। সুন্নাতে রাসুলের মত গুরুত্ব দিয়েই যুগ পরম্পরায় সালাফদের ফাহম সংরক্ষিত হয়ে আসছে। তাবেয়ি সালেহ বিন কায়সান রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি এবং যুহরি ইলম অন্বেষনের জন্য একত্রিত হলাম। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম সুন্নাতসমূহকে লিপিবদ্ধ করব। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে আমরা সেগুলো লিপিবদ্ধ করলাম। অতঃপর যুহরি বলল, সাহাবিদের বক্তব্যও আমরা লিপবদ্ধ করব। কারণ সেগুলোও সুন্নাহর মতো গুরুত্বপূর্ণ। তখন আমি বললাম, না, এগুলো সুন্নাহ নয়। তাই আমি এগুলো লিপিবদ্ধ করব না। বর্ণনাকারী তাবেয়ি বলেন, 'এরপর যুহরি সাহাবিদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করল, কিন্তু আমি করিনি। ফলে সে সফল হয়েছে আর আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।'[৭৯]

এজন্য সাহাবিদের কর্মের ওপরও সুন্নাহ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, চাই সে কর্ম কুরআন-সুন্নাহতে পাওয়া যাক কিংবা না যাক। কারণ হয়তো সেই আমল এমন কোনো হাদিসের ভিত্তিতে তারা পালন করেছেন, যা তাদের কাছে প্রমাণিত, কিন্তু

---

৭৯. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদিস নং ২০৪৮৮

আমাদের কাছে পৌঁছেনি। অথবা ইজতিহাদের ভিত্তিতে কাজটির ওপর তাদের বা তাদের খুলাফাদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৮০]

আমরা যদি যুগে যুগে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন রচনার দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহলেই আমরা দেখতে পাব যে, তারা কতটা গুরুত্বের সাথে সালাফে সালেহিনের আমল ও বক্তব্যকে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন—

১. সমস্ত সিহাহ,[৮১] সুনান[৮২] ও মুসনাদ[৮৩] গ্রন্থগুলোতে গ্রন্থকাররা সাহাবি ও তাবেয়িদের অসংখ্য আমল ও বক্তব্যকে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম বুখারি, ইমাম তিরমিজিসহ সকল মুহাদ্দিসের গ্রন্থে সালাফে সালেহিনের আমল ও বক্তব্যের ভাণ্ডার আপনি দেখতে পাবেন।

২. মুসান্নাফ[৮৪] ও মুজাম[৮৫] গ্রন্থগুলো তো মুসলিম উম্মাহর এই তুরাসকে খুব যত্নের

---

৮০. আলমুওয়াফাকাত, ৪/৪

৮১. **সহিহ :** যেসব হাদিসগ্রন্থে জয়িফ হাদিস বর্জন করে শুধুমাত্র সহিহ ও সহিহভুক্ত (যেমন, হাসান) হাদিস সংকলন করা হয়, তাকে 'সহিহ' বলা হয়। যেমন, সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম।

৮২. **সুনান :** হাদিসের যেসব গ্রন্থ ফিকহি অধ্যায় অনুসারে সংকলন করা হয়, তাকে 'সুনান' বলা হয়। এমন হাদিসগ্রন্থের সংখ্যা প্রচুর।

যেমন :

১. আস সুনান লিল ইমামি আবি দাউদ (২৭৫ হি.)।

২. আস সুনান লিল ইমামি আন-নাসায়ি (৩০৩ হি.)।

৮৩. **মুসনাদ :** হাদিসের যেসব গ্রন্থ সাহাবায়ে কেরামের নামের তারতিব অনুযায়ী সাজানো হয়, তাকে 'মুসনাদ' বলা হয়। এই তারতিব কখনও আরবি বর্ণমালার বিন্যাস অনুযায়ী হয়, কখনও সাহাবিদের মর্যাদার তারতম্য অনুসারে হয়।

এরূপ গ্রন্থের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়।

যেমন :

১. আল মুসনাদ লিল ইমামি আহমাদ (২৪১ হি.)।

২. আল মুসনাদ লিল ইমাম আবি ইয়ালা (৩০৭ হি.)।

৮৪. **মুসান্নাফ :** যেসব হাদিসগ্রন্থে মারফু হাদিসের সাথে সাথে মাওকুফ, মাকতু হাদিসও উল্লেখ করা হয়, এমন হাদিসের গ্রন্থকে 'মুসান্নাফ' বলা হয়।

যেমন :

১. আল মুসান্নাফ লিল ইমাম আব্দির রাজ্জাক (২১১ হি.)।

২. আল মুসান্নাফ ফিল আহাদিসি ওয়াল আসার, লিল ইমামি আবি বকর ইবনে আবি শাইবা (২৩৫ হি.)।

৮৫. **মুজাম :** হাদিসের যেসব গ্রন্থে সাহাবি, শায়খ বা শহরের নামের তারতিব অনুসারে হাদিস

সাথে লিপিবদ্ধ করেছে। প্রতিটি মুসান্নাফ ও মুজাম কিতাব সালাফে সালেহিনের আমল ও কর্মের সোনালি খাজানা। যেমন আবদুর রাজ্জাক ও ইবনে আবি শাইবার মুসান্নাফ। আবদুর রাজ্জাক রহিমাহুল্লাহ তার মুসান্নাফে ২১ হাজারেরও বেশি হাদিস ও আসার (সাহাবিদের বক্তব্য) সংকলন করেছেন। যার মধ্যে অধিকাংশই হলো সালাফদের বক্তব্য। অনুরূপ ইবনে আবি শাইবাহ তার মুসান্নাফে ১৯ হাজারের মতো হাদিস ও আসার একত্রিত করেছেন। সেগুলোর অধিকাংশই হলো সালাফে সালেহিনের বক্তব্য।

৩. প্রতিটি তাফসিরগ্রন্থ সালাফদের বর্ণনার একেকটি খাজানা। এমন কোনো তাফসিরগ্রন্থ নেই, যেখানে সালাফদের ফাহমকে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

৪. হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোতেও আমরা দেখতে পাব যে, ব্যাখ্যাকাররা হাদিসগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করতে গিয়ে প্রধানত সালাফদের ফাহমেরই দ্বারস্থ হয়েছেন। যার দরুন তারা সালাফদের বিভিন্ন বক্তব্য ও আমলকে উল্লেখপূর্বক তার ভিত্তিতে নিজেদের বুঝ প্রসারিত করেছেন।

৫. চার মাজহাবের ফিকহি গ্রন্থগুলোকেও সালাফে সালেহিনের আমল ও বক্তব্যের ভাণ্ডার বলা যায়। তাদের প্র্যাকটিক্যাল আমল ও বক্তব্যের ভিত্তিতেই প্রতিটি মাজহাব গড়ে উঠেছে। যুগ পরম্পরায় তাদের ফাহমের ভিত্তিতেই ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্র বিস্তৃত হয়েছে। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, সালাফদের বুঝের ওপর নির্ভরতা মানে কখনোই ইসলামের গতিশীলতাকে থামিয়ে দেওয়া নয়; বরং এই নির্ভরতার কারণে ইসলামের গতিশীলতা নিরাপদ প্রবাহে প্রবাহিত হয়। পাশাপাশি এতে ইসলামের চিরন্তনতা ও স্থিতিশীলতাও বজায় থাকে।

ওপরে উল্লেখিত প্রতিটি পয়েন্ট থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, প্রত্যেক যুগে উলামায়ে কেরাম সালাফে সালেহিনের ফাহম, ইলম ও ফিকহকে কতটা গুরুত্বের সাথে সংরক্ষণ করেছেন। এবং তারা কেবল সেগুলো বর্ণনাই করেননি; বরং সেগুলোর বিশুদ্ধতাকে সুদৃঢ় করেছেন এবং নিজেরা তার ওপর আমল করেছেন।

সংকলন করা হয়, তাকে 'আল মুজাম' বলা হয়। তবে মুজাম জাতীয় গ্রন্থাবলির বিন্যাস অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরবি বর্ণমালা অনুসারেই হয়ে থাকে। যেমন, ইমাম তাবারানি রহিমাহুল্লাহ (৩৬০ হি.) রচিত—

১. আল মুজামুল কাবির।

২. আল মুজামুল আওসাত।

৩. আল মুজামুস সগির।

ফাহমুস সালাফের ওপর নির্ভরতার দলিল

ইসলামি শরিয়াহর মৌলিক উৎস চারটি। শরয়ি নুসুস বোঝার ক্ষেত্রে কেন আমাদেরকে সালাফদের বুঝের ওপর নির্ভর করতে হবে এবং পরবর্তীদের সাথে সালাফদের বুঝের বিরোধ হলে কেন সালাফদের বুঝকে প্রাধান্য দিতে হবে, এ ব্যাপারে আমরা শরিয়াহর চার উৎস থেকেই এখানে দলিল উপস্থাপন করার চেষ্টা করব।

কুরআন থেকে দলিল

১. মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

'মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথমে ঈমান এনেছে এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানরাজি তৈরি করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহর বহমান। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।'[৮৬]

৮৬. সুরা তাওবা, আয়াত ১০০

এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা প্রথম সারির মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের অনুসরণ করে। আর তারাই হচ্ছে সালাফে সালেহিনের ইমাম। এই প্রশংসা প্রমাণ করে, তাদের বুঝ সঠিক এবং পরবর্তীদের জন্য সে বুঝ অনুসরণ করা প্রশংসনীয় বিষয়। বিপরীত দিক থেকে উক্ত প্রশংসা এটাও প্রমাণ করে যে, দীনের ফাহমের ক্ষেত্রে যাদের বুঝ তাদের বুঝের সাথে সাংঘর্ষিক হবে, তা বাতিল এবং তার অনুসরণ করা নিন্দনীয়।

২. অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَاۤ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِیْ شِقَاقٍ ۚ فَسَیَكْفِیْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ.

'অতঃপর তারাও যদি সে রকম ঈমান আনে, যেমন তোমরা ঈমান এনেছ, তবে তারা সঠিক পথ পেয়ে যাবে। আর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা মূলত শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদের সাহায্যার্থে তাদের দেখে নেবেন এবং তিনি সকল কথা শোনেন ও সবকিছু জানেন।'[৮৭]

এই আয়াতে হেদায়াতকে সাহাবিদের ঈমানের সাথে শর্তযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং উম্মতের জন্য তাদের ঈমানকে মানদণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিশুদ্ধ ঈমান আল্লাহপ্রদত্ত ওহির সঠিক ইলম ও বুঝেরই ফসল। সালাফদের পরে যারা আসবে, তারা যেমন ঈমানের জায়গায় তাদের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না, ঠিক তেমনিভাবে পরবর্তীরা শরয়ি নুসুসকে বোঝার ক্ষেত্রেও তাদেরকে ছাপিয়ে যেতে পারবে না। কেউ যদি এমন দাবি করে, তবে হয়তো সে ভুল বলছে নতুবা ভ্রান্ত হয়ে মিথ্যা বলছে।

৩. আল্লাহ আরও বলেন,

وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا.

'আর যে ব্যক্তি তার সামনে হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসুলের

---

৮৭. সুরা বাকারা, আয়াত ১৩৭

বিরুদ্ধাচরণ করবে ও মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ অনুসরণ করবে, আমি তাকে সেই পথেই ছেড়ে দেব, যা সে অবলম্বন করেছে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।'[৮৮]

এই আয়াতে মুমিনদের পথের মর্মের ভেতর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়ি সকলেই অন্তর্ভুক্ত। আয়াতটিতে একই সাথে মহান আল্লাহ তাআলা সালাফে সালেহিনের দীন পালন ও বোঝার মানহাজকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন এবং যারা তাদের পথ ছেড়ে ভিন্ন কোনো পথ অনুসরণ করতে চায়, তাদেরকে সতর্কবার্তা প্রদান করছেন।[৮৯]

এই আয়াতের ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কেরাম সালাফদের ইজমাকে অকাট্য দলিল এবং ভুল থেকে মুক্ত হিসেবে গণ্য করেছেন। এজন্য সালাফরা যেভাবে নুসুসে শরিয়াহ বুঝেছেন, তার বিরোধিতা করা মূলত ইজমার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া বলে গণ্য হবে। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মুমিনদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। এই আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা সালাফদের বিরোধিতা আর রাসুলের বিরোধিতা করাকে সমতুল্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং যারা নুসুসে শরিয়াহ বোঝা ও তার ওপর আমল করার ক্ষেত্রে সালাফদের বিপরীতে অবস্থান নেবে, তারা প্রকৃতপক্ষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে। আর রাসুলের অবাধ্যতার অর্থ হলো আল্লাহ তাআলারও অবাধ্য হওয়া।[৯০]

ইসলামি শরিয়াহর সঠিক বিশ্বাস ও আমল নির্ভর করে নুসুসে শরিয়াহ ভালো করে বোঝার ওপর। এজন্য আমাদের বিশ্বাস ও আমলকে সালাফদের অনুগামি বানাতে হলে সর্বপ্রথম নুসুসে শরিয়াহ বোঝার ক্ষেত্রে তাদের দ্বারস্থ হতে হবে। আর যে নুসুসে শরিয়াহর ফাহমের ক্ষেত্রে তাদের বিরোধিতা করবে, সে বিশ্বাস ও আমলের ক্ষেত্রেও তাদের বিরোধী হবে এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে।[৯১]

৪. মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

৮৮. সুরা নিসা, আয়াত ১১৫

৮৯. মাজমুউল ফাতাওয়া, ৪/২

৯০. প্রাগুক্ত, ১৯/১৯৩-১৯৪

৯১. তাজকিরুল খালাফ বি ওজুবি ইতিমাদি ফাহমিস সালাফ, পৃষ্ঠা ০৮

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।'[৯২]

ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সাহাবায়ে কেরামই হলেন সত্যবাদীদের সরদার। এমনকি তাদের পরে প্রত্যেকের সত্যবাদিতাই সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করবে; বরং তার সত্যবাদিতার মূল রহস্যই হলো সাহাবিদের অনুসরণ করা এবং তাদের সাথে থাকা।'[৯৩]

সুতরাং কেউ যখন নুসুসে শরিয়াহ বোঝার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে যায়, তখন বুঝতে হবে সে সাহাবিদের সাথে নেই।

৫. আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

'তিনি উম্মিদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসুল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা দেবে, যদিও তারা এর আগে সুস্পষ্ট গোমরাহিতে নিপতিত ছিল।'[৯৪]

ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথপ্রদর্শক ও শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। এটি রিসালাত ও নবুওয়াতের মহান উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের প্রজন্মকে ইলম শিখিয়েছেন। আর তাদের পরবর্তীরা সাহাবিদের কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করেছেন।

---

৯২. সুরা তাওবা আয়াত ১১৯

৯৩. ইলামুল মুয়াক্কিয়িন এর সূত্রে শুবুহাতুন আসরানিয়্যাতুন মাআ আজওয়িবাতিহা গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ১৭

৯৪. সুরা জুমুআ, আয়াত ০২

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে অর্থ, মর্ম ও কায়দা-পদ্ধতিসহ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে সুন্নাহও শিখিয়েছেন পরিপূর্ণ ও যথার্থভাবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইলম হাসিলের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে কোনো কিছুর ব্যবধান ছিল না। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্যরা ইলম ও ফাহমের ক্ষেত্রে তাদের সমতুল্য হবে না। কারণ যিনি সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তার হাতে ইলম অর্জন করেছেন আর যিনি অন্য কারও মাধ্যম হয়ে ইলম লাভ করেছেন, তারা দুজন কখনোই সমান হবে না। শিক্ষা প্রদান ও বর্ণনার ক্ষেত্রে রাসুলের ধারে কাছেও কেউ পৌঁছতে পারবে না।'[৯৫]

যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম রাসুলের কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষা লাভ করেছেন, এজন্য নুসুসে শরিয়াহর ফাহমের ক্ষেত্রে তারাই সত্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী। আর সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাবেয়িরা ইলম অর্জন করেছেন, তাদের থেকে ইলম করেছেন তাবে-তাবেয়িরা। এই দুই প্রজন্ম নিজেদের বুঝকে সাহাবায়ে কেরামের সাথে মিলিয়ে নিতেন। আবার রাসুলের পক্ষ থেকে তাদের ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণাও রয়েছে। ফলে নুসুসে শরিয়াহর ফাহমের ক্ষেত্রে তারাও আমাদের থেকে সত্যের বেশি নিকটবর্তী।

সুন্নাহ থেকে দলিল

১. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

আমার মৃত্যুর পরে তোমরা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। ওই সময় তোমাদের জন্য আবশ্যক হলো, আমার সুন্নাহ এবং আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত পথপ্রদর্শনকারী খলিফাদের সুন্নাহর ওপর অটল থাকা

৯৫. ইলামুল মুয়াক্কিয়িন এর সূত্রে শুবুহাতুন আসরানিয়্যাতুন মাআ আজওয়িবাতিহা গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৩৩

এবং সেটাকে দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরা। তোমরা ওই সময় নব্য আবিষ্কৃত বিষয় থেকে বিরত থাকবে। কারণ নব্য আবিষ্কৃত প্রত্যেক বিষয়ই হলো বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।[৯৬]

এই হাদিসে সুস্পষ্টভাবে কুরআন-সুন্নাহ নিয়ে বিভিন্ন মতের সময় খুলাফায়ে রাশেদিনের পদ্ধতির ওপর অটল থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এই নির্দেশনা একই রকমভাবে সকল সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারেও প্রযোজ্য হবে। আল্লামা শাতেবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাহকে নিজের সুন্নাহর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এতে বোঝা যায়, খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাহর অনুসরণ করা মূলত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহরই অনুসরণ। আর সাহাবীদের আদর্শের বিপরী তথা (তাদের সুন্নাহর বিরোধী) নব্য আবিষ্কৃত বিষয় রাসুলের সুন্নাহরও বিপরীত। দীনের মাঝে এগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। কারণ সাহাবায়ে কেরাম যে পথেই চলেছেন, তাতে হয়তো সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করেছেন, নতুবা তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত থেকে সামগ্রিকভাবে যা বুঝেছেন, তার ভিত্তিতে চলেছেন। এখন বিষয়টা তাদের ছাড়া অন্যদের কাছে অস্পষ্ট হতে পারে। কিন্তু এটার অর্থ কখনোই এমন নয় যে, তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর ওপর কোনো কিছু বৃদ্ধি করেছেন।'[৯৭]

২. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, এরপর তার পরবর্তীদের যুগ, এরপর তার পরবর্তীদের যুগ।[৯৮]

এই হাদিস ১৫ জন সাহাবি বর্ণনা করেছেন। বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম এই হাদিসকে মুতাওয়াতির হাদিসের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। এই হাদিস প্রমাণ করে যে, উক্ত তিন যুগের সালাফে সালেহিন হলেন এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ। ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এই হাদিসের দাবি হলো, কল্যাণের (দীনের) সকল

---

৯৬. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৬০৭; জামে তিরমিজি, হাদিস নং ২৬৭৬, শায়খ আলবানি সহিহ বলেছেন, সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহাহ, হাদিস নং ২৭৩৫

৯৭. আল ইতিসাম, ১/৮৮, ১/১৮৭

৯৮. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ২৬৫১; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৩৫

ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া। যদি তারা নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ হতেন, তবে তাদেরকে সাধারণভাবে শ্রেষ্ঠ যুগের মানুষ বলা হতো না।'[৯৯]

সুতরাং সালাফে সালেহিন সঠিক ইলম, দীনের বিশুদ্ধ বুঝ, গভীর পাণ্ডিত্য ও এসবরে উত্তম বাস্তবায়ন সব ক্ষেত্রেই এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ অংশ ছিলেন। সুতরাং এমন কোনো মাসআলা নেই, যার সঠিকতা ও সত্যতা তারা খুঁজে পাননি। এমনও হয়নি যে, কোনো বিষয়ে তারা সকলেই কিংবা অধিকাংশ ভুল করেছেন! আবার এমনও হয়নি, কেউ কোনো মাসআলায় ভুল করেছেন আর সালাফগণ তাকে সতর্ক না করে চুপ করে থেকেছেন!

সুতরাং এটা হতে পারে না যে, আমাদের বর্তমান সময়ে এসে কথিত কোনো স্কলার সালাফদের কোনো ভুল চিহ্নিত করবে! এটাও সম্ভব নয় যে, কোনো মাসআলায় সালাফগণ সঠিকটা খুঁজে পাননি; কিন্তু এই যুগের কেউ এসে সঠিকটা উম্মাহর সামনে পেশ করছেন! একমাত্র নির্বোধ কিংবা অজ্ঞ ব্যক্তিরাই এমনটা ভাবতে পারে। কেউ যদি কোনো মাসআলায় সালাফদের ব্যাপারে অশুদ্ধতার দাবি করে, তবে সে যেন উম্মাহর এই শ্রেষ্ঠ অংশের ওপর অপবাদ আরোপ করল।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'পরবর্তীদের অনুসরণ করার থেকে সালাফে সালেহিনের অনুসরণ করাই সর্বোত্তম। কারণ তাদের ইজমা বা ঐকমত্য ত্রুটি থেকে মুক্ত। এমনকি যখন কোনো মাসআলায় তাদের ভেতর মতবিরোধ হয়, তখনো হক তাদের ভেতরই সীমাবদ্ধ থাকে।'[১০০]

সুতরাং সালাফে সালেহিনের ফাহম ও মানহাজের ওপর অন্য কারও মানহাজকে প্রাধান্য দেওয়া মূলত সেই সমস্ত নসকে প্রত্যাখ্যান করার নামান্তর, যেগুলো তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। কারণ তারা যদি এই দীন বোঝার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মানহাজের অনুসারী না হয়ে থাকেন, তাহলে তারা কীভাবে অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হবেন। কেউ কেউ বলে থাকেন, সালাফদের এই শ্রেষ্ঠত্ব আমলের ক্ষেত্রে। দীনের বুঝের ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে কেউ কেউ তাদেরকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে! সাহাবি, তাবেয়ি ও তাবে তাবেয়িদের সাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে যে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, এই দাবি তার সাথে পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক।

---

৯৯. ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন, ৪/১৩৬
১০০. মাজমুউল ফাতাওয়া, ১৩/২৪

৩. আবু ওয়াকেদ আল লাইসি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বলেন, 'নিশ্চয় ভবিষ্যতে অনেক ফিতনা আসবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! তখন আমাদের কী হবে, আর আমরা কী-ই বা করব? তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তোমাদের পূর্বের প্রথম সারির লোকদের পথে ফিরে যাবে।'[১০১] অর্থাৎ নিরাপত্তা পেতে হলে তাদেরকে সালাফদের পথে ফিরে যেতে হবে। এখানে সালাফদের পথে ফিরে যাওয়া দীনের বুঝ ও সেই অনুযায়ী আমল সবকিছুকেই শামিল করে।

এই হাদিসে সর্বপ্রথম সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে। রাসুলের মৃত্যুর পর সাহাবিদের জীবদ্দশাতেই মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়ার ইঙ্গিতও আছে এই হাদিসে। সে সময় সাহাবায়ে কেরাম যেন তাদের প্রথম জমানার অবস্থার দিকে ফিরে যান, উল্লিখিত হাদিস থেকে এটা ছিল সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষা। পুরো উম্মতের জন্য হাদিসটির নির্দেশনা হলো, সালাফরা যে পথে ছিলেন এবং যেভাবে কুরআনকে বুঝেছেন, সেটাই হলো উম্মতের জন্য নিরাপদ পন্থা। উম্মতকে সে পথের আলোকেই নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে হবে। যদি তারা এ পথের বাইরে সালাফদের ফাহম ও মানহাজ-বিরোধী কোনো মত ও পথের আবিষ্কার করে, তবে নিশ্চিত তারা বিভ্রান্ত হবে। নিজেরাও দীনের ব্যাপারে ফিতনায় পতিত হবে এবং উম্মতকেও ফিতনায় নিমজ্জিত করবে।[১০২]

সাহাবায়ে কেরাম ও ইমামদের বক্তব্য

নুসুসে শরিয়াহ বোঝার ক্ষেত্রে সালাফদের ওপর নির্ভরশীলতার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে প্রত্যেক জমানার ইমামদের বক্তব্য রয়েছে। এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের কোনো ইমাম দ্বিমত পোষণ করেননি। তারা

১০১. আল মুজামুল কাবির লিত তাবারানি, হাদিস নং ৩৩০৭; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদিস নং ১২৩৩৭। শায়খ আলবানি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন, সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহাহ, হাদিস নং ৩১৬৫

১০২. ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ তার ইলামুল মুয়াক্কিয়িন গ্রন্থে সালাফে সালেহিনের ফাহম ও মানহাজকে আঁকড়ে ধরার প্রয়োজনীয়তা ও কারণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, ৪/১১৮-১৫৬

সকলেই একমত পোষণ করেছেন যে, নুসুসে শরিয়াহ বোঝার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সালাফদের ফাহম ও মানহাজের আলোকেই অগ্রসর হতে হবে। সালাফদের এই ফাহম ও মানহাজের ওপর নির্ভর করে যুগে যুগে ইসলামি শরিয়াহর যে ফিকহি ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে, সেখানকার কোনো স্বীকৃত ও সমাধানকৃত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাওয়া কোনো অজুহাতেই পরবর্তীদের জন্য বৈধ নয়।

সালাফদের কওলের খাজানা থেকে আমরা কিছু বক্তব্য এখানে প্রমাণস্বরূপ তুলে ধরছি—

১. হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'হে কারি সমাজ! তোমরা পূর্ববর্তীদের পথকে আঁকড়ে ধরো। যদি তোমরা তাদের পথে অবিচল থাকো, তাহলে তোমরা অনেক দূরে এগিয়ে যাবে। আর যদি তাদেরকে পরিত্যাগ করে ডানে-বামে চলো, তাহলে তোমরা সঠিক পথ থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়বে।'[১০৩]

যারা কল্যাণ ও সত্যের সর্বদিকে অগ্রগামী, সঠিক বিষয় কখনো তাদের পথের বাইরে থাকতে পারে না। এটা অসম্ভব।[১০৪] এজন্যই মুসাইয়াব ইবনে রাফে রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যখন এমন কোনো বিষয় সামনে আসত, যে ব্যাপারে রাসুলের কোনো নির্দেশনা নেই, তখন সাহাবায়ে কেরাম একত্রিত হতেন এবং কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে একমত হতেন। সুতরাং তারা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, হক তার ভেতরেই আছে। তারা যে মত পেশ করেছেন, হক তার মাঝেই বিদ্যমান।'[১০৫]

২. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তোমরা ইলম উঠিয়ে নেওয়ার আগে ইলম শিখে রাখো... এবং তোমরা প্রাচীন বিষয়কে আঁকড়ে ধরো।'[১০৬] প্রাচীন বিষয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সালাফে সালেহিনের পথ ও আদর্শ। সুতরাং এর ভেতর নুসুসে শরিয়াহ বোঝার ক্ষেত্রে তাদের ফাহম ও তাদের পদ্ধতি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত।

৩. উসমান বিন হাজের রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু

---

১০৩. সহিহ বুখারি, কিতাবুল ইতিসাম, হাদিস নং ৭২৮২

১০৪. ইলামুল মুয়াক্কিয়িন, ৪/১৩৯

১০৫. সুনানুদ দারেমি, হাদিস নং ১১৫

১০৬. সুনানুদ দারেমি, হাদিস নং ১৪৫

আনহুমাকে বললাম, আমাকে নসিহত করুন। তখন তিনি বললেন, "তুমি সঠিক পথে অবিচল থাকো এবং প্রথম বিষয়ের অনুসরণ করো। কখনোই নতুন বিষয় আবিষ্কার করো না।"[১০৭]

প্রথম বিষয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সালাফে সালেহিনের ফাহম ও মানহাজ। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সালাফে সালেহিনের বুঝ ও পদ্ধতির ওপর অটল থাকতে বলেছেন। কারণ তা সঠিক ও নিরাপদ। আর সালাফদের ফাহম ও মানহাজের বিরুদ্ধে নতুন কোনো ফাহম ও মানহাজ আবিষ্কার করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এতে ভ্রান্তি সুনিশ্চিত।

৪. ইমাম আওযায়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তুমি সুন্নাতের ওপর (অটল থাকতে) ধৈর্যধারণ করো। লোকেরা (সালাফরা) যেখানে থেমেছে, তোমরা সেখানে থেমে যাও। আর তারা যা বলেছে তাই বলো এবং যার থেকে তারা বিরত থেকেছে, তুমিও তার থেকে বিরত থাকো। সর্বোপরি সালাফে সালেহিনের পথেই চলো। এই পথই তোমাকে প্রশস্ততার দিকে নিয়ে যাবে, যেভাবে তাদেরকে নিয়ে গেছে।'[১০৮] তিনি আরও বলেন, 'তুমি সালাফদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো, যদিও মানুষ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে।'[১০৯]

৫. ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কোনো ব্যক্তির মতের মাধ্যমে সুন্নাহর বিরোধিতা করা যাবে না এবং কারও কিয়াস দিয়ে সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যানও করা যাবে না। সালাফরা যে বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন, আমরা সে বিষয়েই ব্যাখ্যা করব; যার ওপর তারা আমল করেছেন, তার ওপর আমল করব এবং যা তারা ছেড়ে দিয়েছেন, আমরাও তা ছেড়ে দেব। আমাদের জন্য আদর্শ হলো, তারা যা থেকে বিরত থেকেছেন আমরা তা থেকে বিরত থাকব, তারা যা বলে গেছেন তার আনুগত্য করব, নব্য পরিস্থিতিতে তারা যা গবেষণা করে বের করেছেন ও সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তার অনুসরণ করব। তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন, সে বিষয়ে তাদের জামাত থেকে বের হব না। অর্থাৎ নতুন কোনো মত আবিষ্কার করব না।'[১১০]

---

১০৭. আল ইবানাহ লি ইবনি বাত্তাহ, ১/৩১৯
১০৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৬/১৪৩
১০৯. আশ শরিয়াহ লিল আজুররি, ১/২৬২
১১০. ইজতিমাউল জুয়ুশিল ইসলামিয়্যাহ, ১৫৫

ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর আরেকটি বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ মন্তব্য আছে। সেই মন্তব্যটি যুগের পর যুগ আহলে ইলমের জন্য একটি মূলনীতি ও মানহাজ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তিনি বলেছেন, 'এই উম্মতের প্রথম জামাতকে যে পদ্ধতি সংশোধন করেছে, সে পদ্ধতি ছাড়া এর শেষ অংশও সংশোধন হবে না।'[১১১] অর্থাৎ পরবর্তীদের জন্য মুক্তি, উন্নতি ও সংশোধন সালাফদের ফাহম ও মানহাজেই বিদ্যমান। সালাফদের ফাহম ও মানহাজকে অবজ্ঞা কিংবা উপেক্ষা করে যে সংস্কার ও সংশোধনের দাবি বর্তমান কিছু চিন্তাবিদ উত্থাপন করেন, সেটা কখনো উম্মতের সংস্কার ও সংশোধন করবে না; বরং এই উম্মতকে বিকৃত ও বিভ্রান্ত করবে। তাদেরকে দীনে ইসলামের অনুসরণ থেকে বের করে প্রবৃত্তি ও অমুসলিমদের পথের অনুসারী বানাবে।

৬. ইমাম যাহাবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হে আল্লাহর বান্দা! যদি তুমি ইনসাফ করতে চাও, তাহলে কুরআন-সুন্নাহর নুসুসের ব্যাপারে জানো। তারপর দেখো সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ি ও আইম্মায়ে তাফসির এই আয়াতের ব্যাপারে কী বলেছেন এবং তারা সালাফদের কী কী মাজহাব বর্ণনা করেছেন। তারপর হয়তো তুমি ইলম সহকারে কথা বলো, নতুবা ইলম সহকারে চুপ থাকো।'[১১২]

৭. ইয়াহইয়া বিন ইয়ামার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'বসরায় তাকদিরের ব্যাপারে সর্বপ্রথম ভ্রান্তিপূর্ণ কথা বলে মাবাদ আল জুহানি। তখন আমি এবং হুমাইদ বিন আবদুর রহমান আল হিময়ারি হজ বা উমরা করতে গেলাম। আমরা বললাম, যদি আমরা আল্লাহর রাসুলের কোনো সাহাবির দেখা পাই, তাহলে তাকে তাকদিরের ব্যাপারে এরা যা বলছে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব...।'[১১৩]

এই আসার থেকে বোঝা যায়, তাবেয়িরা সাহাবায়ে কেরামের বুঝকে শুদ্ধতা ও বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে মানদণ্ড মানতেন। যার জন্য তারা মাবাদের বক্তব্যকে সাহাবির কাছে তুলে ধরার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। যদি সাহাবি মাবাদের কথাকে সমর্থন দিতেন, তাহলে তারা মাবাদের বক্তব্য মেনে নিতেন। আর যদি রাসুলের সাহাবি তার বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করতেন, তাহলে তারাও এই বক্তব্যকে ছুড়ে ফেলতেন।

---

১১১. আশ শিফা, কাজি ইয়াজ রহ. ২/৭১

১১২. আল উলুয়্যু লিল আলিয়্যিল গাফফার (اَلْعُلُوُّ لِلْعَلِيِّ الْغَفَّارِ), পৃষ্ঠা ১৬

১১৩. ঘটনাটি সহিহ মুসলিমে বিস্তারিত এসেছে। সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ০৮

৮. ইমাম আবুল হাসান আশআরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যে কথা আমরা বলি, যে দীনকে আমরা আল্লাহর জন্য ধারণ করি তা হলো, আমাদের রবের কিতাব, আমাদের নবির সুন্নাত এবং সাহাবি, তাবেয়ি ও আইম্মায়ে হাদিস থেকে যা বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে আঁকড়ে ধরা। আমরা এগুলোর ওপরই অনড় থাকি।'[১১৪]

৯. ইমাম শাতেবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'শরয়ি দলিলের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেককেই লক্ষ রাখতে হবে সালাফরা নুসুস থেকে কী বুঝেছেন। তারা যার ওপর আমল করতেন সেটাই সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে মজবুত।'[১১৫] তিনি আরও বলেন, 'যারাই (নুসুসে শরিয়াহ বোঝার ক্ষেত্রে) সালাফদের বিরোধিতা করে, সে ভুলের ওপর আছে।'[১১৬]

১০. ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'নুসুস বোঝার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ভ্রান্তি হতে বাঁচতে হলে লোকদের দুটি বিষয় আত্মস্থ করতে হবে। প্রথমত, কিতাব ও সুন্নাহর মাঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শব্দাবলি বোঝা এবং এই শব্দাবলির উদ্দেশ্য জানতে সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের অনুসরণ করা। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবিদের কিতাব-সুন্নাহ দ্বারা সম্বোধন করতেন, তখন এর দ্বারা মূলত কী উদ্দেশ্য, সেটাও তাদের জানিয়ে দিতেন।'[১১৭]

এ ধরনের অসংখ্য বক্তব্য আছে। এই গ্রন্থে সকল বক্তব্য আমরা একত্রিত করব না। কারণ এটি দীর্ঘ আলোচনার কোনো গ্রন্থ নয়। আমরা চেষ্টা করেছি সংক্ষিপ্তভাবে সামগ্রিক একটি চিত্র পাঠকের সামনে স্পষ্ট করতে, যেন পাঠক ইসলামকে বিকৃত ও পরিবর্তন করার এই দ্বারকে সর্বদার জন্য বন্ধ করে রাখতে পারেন।

ইজমা

নুসুসে শরিয়াহ বোঝার ক্ষেত্রে সালাফদের ফাহম ও মানহাজের ওপর নির্ভরশীল হওয়া এবং তাদের থেকে প্রাপ্ত মুতাওয়ারিস ফাহম ও মানহাজকে উপেক্ষা

---

১১৪. আল ইবানাহ আন উসুলিদ দিয়ানাহ, পৃষ্ঠা ০৮

১১৫. আল মুওয়াফাকাত, ৩/২৮৯

১১৬. প্রাগুক্ত, ৩/২৮১

১১৭. মাজমুউল ফাতাওয়া, ১৭/৩৫৩

না করা আইম্মায়ে কেরামের সর্বস্বীকৃত একটি বিষয়। সালাফদের ফাহম ও মানহাজের ওপর ভিত্তি করেই ইসলামি শরিয়াতের বিশাল ফিকহি ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। ফিকহের প্রসিদ্ধ চারটি মাযহাব এই ভাণ্ডার থেকেই সমৃদ্ধ হয়েছে। আর এই বিষয়ে উম্মাহর মাঝে মুতাওয়ারিস ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে যে, নুসুসে শরিয়াহ বোঝার জন্য আমাদেরকে সালাফে সালেহিন থেকে তাওয়ারুস সূত্রে প্রাপ্ত বুঝের ওপরই নির্ভরশীল হতে হবে এবং মুতাওয়ারিস এই ফাহম-বিরোধী কোনো ব্যাখ্যা, মত ও বুঝ দাঁড় করানো যাবে না। এজন্য তাফসিরের মূলনীতি ও হাদিস বোঝার মূলনীতি বিষয়ক সকল গ্রন্থেই নুসুসে শরিয়াহ বোঝার জন্য ফাহমুস সালাফকে প্রধান একটি উৎস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কুরআন-সুন্নাহ ও সব ঘরানার আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এটি সুনিশ্চিত বিষয় যে, আমল, ইলম ও আকিদাসহ সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বদিক থেকে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ অংশ হলো প্রথম যুগের মানুষ, অতঃপর তার পরের প্রজন্ম এবং এরপর তার পরের প্রজন্ম। যেমনটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস থেকে নিঃশর্তভাবে প্রমাণিত। ... এবং তারা যেকোনো সমস্যার সমাধানেও পরবর্তীদের থেকে শ্রেষ্ঠ। যে ইসলামের আবশ্যকীয় বিষয়াবলির সাথে হঠকারিতা প্রদর্শন করে এবং যাকে আল্লাহ জ্ঞাতসারেই পথভ্রষ্ট করেছেন, সে ছাড়া এই বিষয়টিকে কেউ প্রত্যাখ্যান করবে না।'[১১৮]

আল্লামা আলায়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'নির্ভরযোগ্য বিষয় হলো, সাহাবায়ে কেরাম থেকে যে মত বর্ণিত হয়েছে তার অনুসরণ করা; তাদের বক্তব্য ও ফতোয়াকে গ্রহণ করে নেওয়ার ওপর তাবেয়িরা ঐকমত্য হয়েছেন। এই বিষয়ে তাদের কারও দ্বিমত নেই।'[১১৯]

ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক জমানার আহলে ইলমরাই এ ব্যাপারে একমত ছিলেন যে, তারা সকলেই সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়া ও বক্তব্য দিয়ে দলিল পেশ করতেন। এ ব্যাপারে তাদের কেউ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি। আহলে ইলমের কিতাবাদি এর সুদৃঢ় সাক্ষী।[১২০]

---

১১৮. মাজমুউল ফাতাওয়া, ৪/১৫৮

১১৯. ইজমালুল ইসাবাহ ফি আকওয়ালিস সাহাবা, পৃষ্ঠা ৬৬

১২০. ইলামুল মুয়াক্কিয়িন এর সূত্রে শুবুহাতুন আসরানিয়্যাতুন মাআ আজওয়িবাতিহা গ্রন্থ থেকে

উপমহাদেশের অন্যতম গ্রহণযোগ্য একজন ইলমি বক্তিত্ব হলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি রহিমাহুল্লাহ। উপমহাদেশে প্রতিটি দীনি ধারা উনাকে নিজেদের ইলমি সিলসিলার সূত্র মনে করেন। সালাফদের ফাহম ও মানহাজ সম্পর্কে তিনি খুবই সংবেদনশীল ছিলেন। তার প্রতিটি গ্রন্থেই এর প্রমাণ বিদ্যমান। বিশেষত তার বিখ্যাত গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ এর ভূমিকা পড়লেই সালাফদের ইলমের প্রতি তার আস্থা ও সংবেদনশীলতার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ভূমিকার এক জায়গায় তিনি বলেন, 'আমার থেকে প্রকাশিত প্রত্যেক এমন বক্তব্য যা আল্লাহর কিতাবের আয়াত, রাসুলের প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ, খাইরুল কুরুন তথা সালাফে সালেহিনের ইজমা এবং জমহুর মুজতাহিদিন ও অধিকাংশ মুসলিমদের বিরুদ্ধে যায়, আমি তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যদি আমার থেকে এমন কিছু প্রকাশ পায়, তবে নিঃসন্দেহে তা ভুল। যারা আমাদেরকে তন্দ্রা থেকে জাগিয়েছেন, উদাসীনতা থেকে সতর্ক করেছেন, আল্লাহ তাদের ওপর রহম করুন! আমিন।'[১২১]

যুগে যুগে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল ওয়াল জামাআতের অবস্থান এটাই ছিল। আহলুস সুন্নাহর সকল ইমাম কুরআন ও সুন্নাহকে সালাফদের ফাহম অনুযায়ী ধারণ করতেন। উম্মতকেও সালাফে সালেহিনের পথে অবিচল থাকতে উদ্বুদ্ধ করতেন। কারণ এই পথই নিরাপদ ও সত্যের অধিক নিকটতম। মুসলিম উম্মাহর দীর্ঘ চৌদ্দশ বছরের ইতিহাস এটাই প্রমাণ করে যে, যারাই সালাফদের ফাহম ও মানহাজ থেকে বেরিয়ে গেছে, তারা উম্মাহর ভেতর দীন বিকৃতি ও ভ্রান্ত ফিরকার আবির্ভাব ঘটিয়েছে। দিনশেষে তারা ইসলামের ইতিহাসে ভ্রান্ত হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৫৩; ইবনুল কায়্যিমিল জাওযিয়াহ রহিমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত গ্রন্থ ইলামুল মুয়াক্কিয়িন গ্রন্থে ৪/১১৮-১৫৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

১২১. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, পৃষ্ঠা ৩৭

ফাহমুস সালাফ আঁকড়ে ধরার শুভ পরিণাম

নুসুসে শরিয়াহ বোঝার ক্ষেত্রে সালাফদের ফাহম আমাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় ও দুর্গ। এই দুর্গ আমাদের আকিদা, ফিকির, ইলম, আমলকে সব ধরনের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। বিজাতীয় সভ্যতার দাপট, প্রবৃত্তির তাড়না ও বিবেকের স্বেচ্ছাচারিতা থেকে ফাহমুস সালাফ আমাদের চিন্তাকে নিরাপদ রাখবে। সালাফদের ফাহম ও মানহাজের ওপর নির্ভরশীলতা আমাদের ইলমি ও ফিকরি জীবনে বেশ কিছু উপকারিতা নিয়ে আসবে। যথা—

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বাণীর প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারা। মানব জীবনে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদত করার জন্য। তারপর ওহি দিয়ে রাসুল পাঠিয়েছেন আমাদেরকে তার দাসত্ব বাস্তবায়নের গাইডলাইন দেওয়ার জন্য। এটা মানব জীবনের প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন পরিপূর্ণ নির্ভর করছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বাণীর মর্ম বোঝার ওপর। আর বিশুদ্ধভাবে নুসুসে শরিয়াহর মর্ম জানার ও আয়ত্ত করার একমাত্র মাধ্যম হলো সালাফে সালেহিনের ফাহম ও মানহাজ।

২. উল্লেখিত প্রথম উপকারিতা ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে প্রাপ্ত। আর দ্বিতীয় উপকারিতা হচ্ছে, দীনের মাঝে তাবদিল (পরিবর্তন), তাহরিফ (বিকৃতি) ও বিদআত আবিষ্কারের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া। কারণ তাবদিল, তাহরিফ ও বিদআতের প্রধানেই আছে নুসুসে শরিয়াহ বোঝার ক্ষেত্রে সালাফদের ফাহম ও

মানহাজকে প্রত্যাখ্যান করা। নিজের মনমতো কিংবা বিজয়ী কালচারের সাথে মিলানোর জন্য নুসুসে শরিয়াহর ভ্রান্ত ব্যাখ্যা তৈরি করা। সালাফদের ফাহমের মাধ্যমেই আমরা বর্তমানে দীনের মাঝে তাহরিফ চিহ্নিত করতে পারব। তাদের ফাহম ও মানহাজ উম্মাহর জন্য সঠিক ও বেঠিকের মাপকাঠি। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

'অতঃপর তারাও যদি সে রকম ঈমান আনে যেমন তোমরা ঈমান এনেছ, তবে তারা সঠিক পথ পেয়ে যাবে। আর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা মূলত শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদের সাহায্যার্থে তাদের দেখে নেবেন এবং তিনি সকল কথা শোনেন ও সবকিছু জানেন।'[১২২]

৩. অবৈধ মতবিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা থেকে বেঁচে থাকা যায়। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলেন, 'এই উম্মত কীভাবে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, অথচ তাদের নবি এক, কিবলা এক?' তখন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন! কুরআন আমাদের সামনে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা এই কুরআন পড়েছি এবং অবগত হয়েছি কোন ক্ষেত্রে তা নাজিল হয়েছে। আমাদের পরে এমন কিছু সম্প্রদায় আসবে, যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু কী ব্যাপারে তা অবতীর্ণ হয়েছে, তা জানবে না। ফলে তারা তাদের নিজস্ব মত তৈরি করবে। আর যখন তাদের নিজস্ব মত তৈরি হবে, তখন তারা পরস্পরে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে এবং লড়াই করবে।'[১২৩]

এই আসারে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন যে, সাহাবায়ে কেরামের সামনে নুসুসে শরিয়াহ অবতীর্ণ হয়েছে। ফলে নুসুসে শরিয়াহর মর্মের ব্যাপারে তারাই ভালো অবগত। এজন্য নুসুসে শরিয়াহ বোঝার ক্ষেত্রে তাদের বুঝের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। কিন্তু উম্মাহর ভেতর এমন কিছু লোক আসবে,

---

১২২. সুরা বাকারা, আয়াত ১৩৭

১২৩. শুআবুল ঈমান লিল বায়হাকি, হাদিস নং ২০৮৬

যারা নুসুসে শরিয়াহ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের বুঝের তোয়াক্কা করবে না। সেগুলো জানবে না কিংবা সেগুলো জানলেও বিবেচনায় নেবে না; বরং তারা নিজস্ব প্রবৃত্তি অনুযায়ী নুসুসে শরিয়াহ বোঝার চেষ্টা করবে। তখনই তারা মুসলিমদের ভেতর ভ্রান্তি ও বিভেদ সৃষ্টি করবে।

এক হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বনি ইসরাইল ৭২টি দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে। তারা সকলেই জাহান্নামে যাবে একটা দল ছাড়া। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! সেটি কোন দল? তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে দল আমার ও আমার সাহাবিদের পথের ওপর থাকবে।'[১২৪]

এই হাদিস থেকেও আমরা বুঝতে পারি, সালাফদের ফাহম ও মানহাজ পরিত্যাগ আমাদের বিভক্তির দিকে ঠেলে দেবে। হাদিসে বিভক্তির ক্ষেত্রে ইফতিরাক (বিভেদ) শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে, ইখতিলাফ (মতভিন্নতা) নয়। কারণ মুসলিমদের ভেতর মতভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক। স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামের ভেতরও ইখতিলাফ বা মতভিন্নতা ছিল। এজন্য ইখতিলাফ বৈধ, কিন্তু ইফতিরাক তথা বিভেদ বৈধ নয়। সালাফদের ফাহম ও মানহাজ অনুযায়ী চললে আমরা ইফতিরাক ও বিভক্তি থেকে বাঁচতে পারব। তবে আমাদের ভেতর ইখতিলাফ বা মতভিন্নতা থাকবে। যেমন চার মাজহাবের ইমামগণের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। ফলে এখানে কেউ এই হাদিস দেখিয়ে ফিকহি স্কুল অফ থটগুলোকে ভ্রান্ত ফিরকার অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে না। কারণ সালাফদের ফাহম ও মানহাজের ভেতর থেকে উম্মাহর ভেতর মতভিন্নতা হলে সেটা স্বীকৃত বিষয়। এ মতভিন্নতার কারণে কোনো ধারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ থেকে বহির্ভূত হয়ে বাতিল ফিরকায় রূপান্তরিত হবে না। উপরন্তু যে বিরোধ সালাফদের ফাহম ও মানহাজ বহির্ভূত কিংবা বিরোধী হবে, সে বিরোধই বাতিল হিসেবে গণ্য হবে। এখান থেকে আমরা সূক্ষ্ম একটি বিষয় বুঝতে পারি, তা হলো, বর্তমানে আমরা কিছু মানুষকে দেখি, তারা উম্মাহর দীর্ঘ বছরের স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত মতের বিরুদ্ধে গিয়ে, আরও সুস্পষ্ট করে বললে সালাফদের ফাহম ও মানহাজের বিপরীতে গিয়ে নতুন মত প্রকাশ করে এবং

---

১২৪. জামে তিরমিজি, হাদিস নং ২৬৪১, হাদিসটির সনদ হাসান। ইমাম তিরমিজি রহিমাহুল্লাহ এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে বলেন,

هذا حديث مفسّرحسن غريب لا نعرف مثل هذا إلاّ من هذا الوجه.

এটাকে ইখতিলাফ বা মতভিন্নতা বলে স্বাভাবিককরণের চেষ্টা করে। এটি সম্পূর্ণ ভুল প্রচেষ্টা। এ ধরনের ভিন্নমত বৈধ ইখতিলাফ বা মতভিন্নতা হিসেবে বিবেচিত হবে না। এ ধরনেরভিন্নমতকে আমরা তাহরিফ ও ইফতিরাক হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। কারণ এই মতভিন্নতা কুরআন-সুন্নাহর মানদণ্ডের আওতায় থেকে হয়নি। বৈধ ইখতিলাফ হিসেবে সেই মতোই গণ্য হবে যেটা কুরআন-সুন্নাহর মানদণ্ডের আওতায় থেকে সৃষ্টি হবে।

৪. ফাহমুস সালাফ সামনে থাকলে চিন্তার প্রশান্তি ও ভারসাম্য লাভ হবে। কারণ সালাফদের ফাহম ও মানহাজকে কষ্টিপাথর হিসেবে বিবেচনায় রাখলে একজন ফকিহ ও তালেবুল ইলম তাদের চিন্তা ও গবেষণাকে যাচাই করে নিতে পারবে। যখন দেখবে তার চিন্তা ও গবেষণা সালাফদের ফাহম ও মানহাজের সাথে মিলে যাচ্ছে, তখন সে নিশ্চিন্ত থাকবে ও প্রশান্তি অনুভব করবে। কিন্তু পক্ষান্তরে নুসুসে শরিয়াহ বোঝার ক্ষেত্রে কারও চিন্তা ও গবেষণাকে পরখ করার যদি কোনো কষ্টিপাথর না থাকে, তবে নিশ্চিতভাবে তার ভেতর অস্থিরতা কাজ করবে। এটা তার চিন্তা ও গবেষণাকে অস্থির ও ভারসাম্যহীন করে ছাড়বে। তার চিন্তা ও গবেষণা সর্বদাই একটি আপেক্ষিক বিষয় হয়ে থাকবে। গ্রহণীয় হওয়ার মতো নিশ্চয়তা লাভ করবে না।

সালাফদের ফাহম ও মানহাজ থেকে বিচ্যুতির কারণ

সালাফদের ফাহম ও মানহাজের ওপর নির্ভরশীলতার ব্যাপারে আধুনিক মুসলিমদের ভেতর উপেক্ষার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছে, এর পেছনে মৌলিক কিছু কারণ আছে। প্রবৃত্তির তাড়না, দুনিয়া ও অর্থের প্রতি অধিক টান, পদ ও পার্থিব শান্তির প্রতি ব্যাকুলতা, কারও প্রতি বিদ্বেষ ইত্যাদির কারণে ফাহমুস সালাফকে প্রত্যাখ্যান করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। কারণ নুসুসে শরিয়াহকে সালাফদের ফাহমের আলোকে বুঝতে গেলে এই পথগুলোতে বাধা সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে নিজের মতো করে বুঝতে চাইলে এই বাধাগুলো এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নুসুসকে তার মূল অর্থ থেকে সরিয়ে ফেলার কারণে। তবে এর মৌলিক কিছু কারণ আছে, আমরা কেবল সেগুলো এখানে উল্লেখ করতে চাচ্ছি।

১. পাশ্চাত্য মূল্যবোধের কাছে মানসিক পরাজয়। যার দরুন যখন পশ্চিমা বিশ্ব তাদের কিছু মৌলিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে ইসলামের কিছু বিধানের ওপর আপত্তি উত্থাপন করে, তখন তাদের আপত্তি থেকে বাঁচার জন্য কিংবা ইসলামকে তাদের সামনে গুড (ভালো) হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য উক্ত বিধানগুলোর নতুন ব্যাখ্যা তৈরির প্রয়োজন দেখা দেয়। আর এই নতুন ব্যাখ্যার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো 'সালাফদের ফাহম ও মানহাজ'। তখন তারা পশ্চিমা মূল্যবোধ ও মানদণ্ডকে প্রশ্নবিদ্ধ করার পরিবর্তে ইসলামের মুতাওয়ারিস বিধানেই পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধনের পথ খোঁজে।

বিশেষত রাষ্ট্রনীতি, হুদুদ, জিহাদ, নারী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমরা সালাফদের ফাহম ও মানহাজকে বেশি উপেক্ষিত হতে দেখতে পাই। কারণ এই বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে পশ্চিমা মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলামের নতুন ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা জ্ঞানগত জায়গা থেকে তৈরি হয়নি। এই প্রবণতার মূল আকর্ষণই হলো, বর্তমান বিজয়ী সভ্যতার সাথে ইসলামকে খাপ খাওয়ানো। আর আধুনিক অনেক মুসলিম তো নিজেদের এই মনোবাসনার কথা অকপটেই বলে বেড়ায়।

প্রত্যেক যুগেই মুসলিমদের ভেতর এমন কিছু লোক থাকত, যারা যুগের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নুসুসে শরিয়াহর নতুন ব্যাখ্যা আবিষ্কার করার জন্য প্রয়াস চালাত। অতীতে যখন মুসলিম বিশ্বে গ্রিক দর্শনের সয়লাব হয়েছিল, তখন একদল লোক শরিয়াহর বিভিন্ন নুসুসকে গ্রিক দর্শন অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে নিয়োজিত ছিল। তখনকার সকল উলামায়ে কেরাম তাদের বিরুদ্ধে ভ্রান্তির অভিযোগ তোলেন এবং মুসলিম উম্মাহকে তাদের ব্যাপারে সতর্ক করেন। ইলমে শরিয়াহ সংরক্ষণের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআলার ওয়াদা এবং সালাফদের অনুসারী আইম্মায়ে কেরামের মেহনতের ফলে গ্রিক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত সেই ধারা ইসলামি জ্ঞানতত্ত্বে স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি; বরং তারা ভ্রান্ত ফিরকা হিসেবে মুসলিম-সমাজে পরিচিতি লাভ করে।

আজও আমরা দেখতে পাই, ইউরোপীয় সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একদল লোক নানা অজুহাতে ফিকহি ভাণ্ডারের স্বীকৃত ও মীমাংসিত বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করছে, শুধুমাত্র ইউরোপীয় সভ্যতার সাথে সেগুলো সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা এখনো বহাল আছে। কালের পরিক্রমায় এ ধরনের লোকগুলোর বিচ্ছিন্ন ও মুতাওয়ারিস ফিকহের বিরোধী মতামত ভ্রান্ত ফিরকার তুরাসে স্থান লাভ করবে। ইসলামের মৌলিক ও মুতাওয়ারিস জ্ঞানতত্ত্বে এসব মতামত কোনো গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে না। যা কিয়ামত পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাআলার হুকুমে বহাল থাকবে।

২. ইসলামি শরিয়াহ প্রায়োগিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না থাকা। সালাফদের ফাহম ও মানহাজকে উপেক্ষা করার এটাও একটি অন্যতম কারণ। কারণ যখন কেউ লক্ষ করে, সালাফদের থেকে তাওয়ারুস সূত্রে নুসুসে শরিয়াহর যে বুঝ আমরা লাভ করেছি সেটার কোনো বাস্তবিক প্রয়োগক্ষেত্র আমাদের সামনে নেই, তখন তার

কাছে সালাফদের ফাহমকে নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য প্রযোজ্য এবং বর্তমান সময়ের জন্য অকেজো মনে হয়। কিংবা ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে সালাফদের ফাহম মানতে গেলে দেখা যায় অনেক বাধা ও সমস্যার শিকার হতে হয়। তাই ঝামেলা এড়ানো অথবা ইসলামকে বর্তমানের সাথে মিলিয়ে উপস্থাপনের জন্য নুসুসে শরিয়াহকে নতুন করে ব্যাখ্যার দিকে ঝুঁকে যায়। আর এই ঝোঁক থেকে বিভিন্ন ফাঁকফোকর দিয়ে সালাফদের ফাহম ও মানহাজকে প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করা হয়।

৩. ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিম প্রাচ্যবিদদের লেখা বইপত্র, প্রবন্ধ ইত্যাদি পড়া।

মুসলিম কিংবা অমুসলিম দেশের সেকুলার মডেলের প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ইসলাম ও ইসলামের নির্দিষ্ট কোনো সাবজেক্টে পড়াশোনা করা।

অথবা অমুসলিম থেকে মুসলিম হওয়া ব্যক্তিদের লেখাপত্রকেই দীন বোঝার একমাত্র উপাদান বানিয়ে নেওয়া।

সাধারণত এই তিন শ্রেণির মানুষের ভেতর সালাফদের ফাহম ও মানহাজ প্রত্যাখ্যান করার মানসিকতাটা একটু বেশি দেখা যায়। এর কারণ হচ্ছে, এই তিনটা ধারাতেই মূলত দীনি ইলম অর্জনের মুতাওয়ারিস ও নিরাপদ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় না। এই ক্ষেত্রগুলোতে ইসলামকে আল্লাহর মনোনীত দীন বা অনুসরণীয় পদ্ধতি হিসেবে পাঠ করা হয় না। ইসলামকে কেবল একটি মতবাদ ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা হিসেবে পাঠ করা হয়।

৪. অজ্ঞতা। কারণ হিসেবে অজ্ঞতার ব্যাপারটি এখানে ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে। সালাফদের জীবন, তাদের জ্ঞানসাধনা, ঈমান, তাকওয়া ও আমল ইত্যাদি সম্পর্কে কারও অজ্ঞতা থাকতে পারে। যার দরুন সে সালাফদের ব্যাপারে এমন বিশ্বাস স্থাপন করে রাখে, যেটা আসলে বাস্তব না। আবার কারও ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রগুলোর সৌন্দর্য ও যথার্থতার ব্যাপারে অজ্ঞতা থাকতে পারে। যার দরুন সে এসব জ্ঞানশাস্ত্রের উসুল ও ফুরু তথা মূল ও শাখা উভয় জায়গাতেই পরিবর্তন সাধনের দাবির দিকে ঝুঁকে পড়ে।

এগুলো একদম মৌলিক কিছু কারণ। সালাফদের ফাহম ও মানহাজের ব্যাপারে সংশয়গ্রস্ত বা উপেক্ষা প্রদর্শনকারী প্রত্যেকের ভেতর উল্লিখিত সবগুলো

কারণের প্রভাব থাকবে এটা জরুরি না; বরং ভিন্ন ভিন্ন একক কারণেও কারও ভেতর এই প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে। আবার কারও মাঝে উল্লিখিত প্রবণতা সৃষ্টি হওয়ার পেছনে ভিন্ন কোনো কারণও থাকতে পারে, যা এখানে উল্লেখ নেই। আল্লাহু আলাম!

সংশয় নিরসন

প্রথম সংশয় : মানবসত্তা ও ফাহমুস সালাফ

সালাফরা মানুষ, তারা কেউই নিষ্পাপ নন। তাদের বুঝও মানবিক সত্তা থেকে নির্গত। ফলে তাদের বুঝ কখনোই ওহির মতো শরয়ি মর্যাদা রাখে না এবং তা উম্মতের জন্য ওহির মতো মানা আবশ্যকও নয়। এর মাধ্যমেই শরিয়াহ ও ফিকহের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। শরিয়াহ আল্লাহপ্রদত্ত উৎস, যা সর্বাবস্থায় অনুসরণ করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে ফিকহ বা সালাফদের ফাহম হলো মানবীয় উৎস, যা ওহির মতো মানা জরুরি নয় এবং তা শরয়ি মর্যাদাও রাখে না। ফলে সর্বক্ষেত্রে উম্মত তা সবসময় মানতে বাধ্য নয়।

নিরসন :

কোনো সন্দেহ নেই যে, সালাফরা কেউ নিষ্পাপ নন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো, নবি-রাসুলগণ ছাড়া আর কোনো মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। এমনকি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ছাড়া আর কারও নির্দেশ নিঃশর্তভাবে পালনযোগ্য নয়—এই কথাতে কেউ দ্বিমত রাখতে পারে না।

কিন্তু যে বুঝের ওপর সালাফরা একমত হয়েছেন সে বুঝ নির্ভুল এবং শরিয়াতের

দলিল। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মত কখনোই ভ্রান্তির ওপর একমত হবে না।'[১২৫] এজন্য তাদের বুঝ নির্ভুল। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সালাফদের ইজমা ভুল থেকে মুক্ত। এমনকি মতবিরোধপূর্ণ বিষয়েও হক তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাদের বক্তব্যের ভেতরই হককে তালাশ করা যাবে, অন্য কোথাও নয়। কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া তাদের কওল তথা কথা ও বুঝকে ভুল বলা যাবে না।'[১২৬]

যেহেতু তারা ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তাদের থেকেও ভুল হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার, তাই মাঝে মাঝে যদি সাহাবিদের কারও থেকে যদি কোনা ভুল হয়ে যেত, তখন অবশ্যই অবশ্যই অন্যান্য সাহাবিরা এ বিষয়ে তাকে সতর্ক করতেন। অর্থাৎ কেউ ভুল করলে অন্যরা এ ব্যাপারে কোনো রকম সতর্ক করা ব্যতীত চুপ ছিলেন– এটা অসম্ভব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাহাবিদেরকে এমন কল্যাণের জামাআত বানিয়েছেন যে, তাদের মাঝে কোনো ভুলকে স্থায়ী হতে দেননি। তাদেরকে এমন ঈমানি শক্তি দিয়েছেন যে, শরিয়াতের বিষয়ে কোনো ভুল প্রকাশ পাবে, আর তারা মুখ বন্ধ করে থাকবেন–তা হতে পারে না। তাই এখানে মূলনীতি এটা যে, সাহাবিদের জামাআতের মাঝে কেউ কেউ ভুল করতে পারেন, কিন্তু পুরো জামাআতের মাঝে সত্য ও হকের অধিকারী কেউ থাকবে না, তা হতে পারে না। আর যিনি সত্য ও হকের অধিকারী হবেন, তিনি মানুষদের সতর্ক করা ছাড়া চুপ থাকবেন, তাও অসম্ভব।[১২৭]

এজন্য সালাফরা যদি কোনো ফাহম বা মতের ওপর একমত হন, তাহলে নিঃসন্দেহে সেটা আমাদের জন্য দলিল এবং তা নির্ভুল। তাদের এই ঐকমত্যপূর্ণ ফাহমকে মূল ধরে আমরা নিজেদের ফাহমকে অগ্রসর করতে পারি। আর যদি কোনো নুসুসে শরিয়াহর ফাহম নিয়ে তাদের ভেতর আমরা গ্রহণযোগ্য ইখতিলাফ পাই, তাহলে সে ক্ষেত্রে আমাদের অধিকার আছে যেকোনো একটিকে বেছে নেওয়ার।[১২৮]

---

১২৫. সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ২১৬৭, শায়খ আলবানি রহ. সহিহ বলেছেন। (সহিহুল জামে, হাদিস নং ১৮৪৮)

১২৬. মাজমুউল ফাতাওয়া, ৪/১৫৫

১২৭. দেখা যেতে পারে : ইলামুল মুয়াক্কিয়িন ৪/১৫৫

১২৮. তবে সাহাবিদের মাঝে হওয়া ফিকহি ইখতিলাফ বা মতভিন্নতা থেকে যে-কেউ চাইলেই নিজের জন্য কোনো মত বাছাই করে নিতে পারবে বা প্রত্যেকে যার যার মতো করে কোনো মত গ্রহণ করে

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইখতিলাফ গ্রহণে অবশ্যই আমাদের ইসলামি ফিকহে গ্রহণযোগ্য ইখতিলাফকে বেছে নিতে হবে। যে ইখতিলাফের পেছনে বিশুদ্ধ দলিল থাকে না, যে ইখতিলাফ পূর্ববর্তী সালাফদের বিরুদ্ধে যায় এবং যে ইখতিলাফ ফিকহি তুরাসে স্বীকৃতি লাভ করেনি (অর্থাৎ ফকিহরা যেটা মতবিরোধ হিসেবে নয়, বিচ্ছিন্ন মত হিসেবে বিবেচনা করেছেন), সে ইখতিলাফ কখনো অনুসরণযোগ্য নয়। এ ইখতিলাফ বিচ্ছিন্ন মত হিসেবে পরিচিত। এ ধরনের ইখতিলাফ দিয়ে উলামায়ে কেরামের ইজমাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না। বিচ্ছিন্ন মত দিয়ে জমহুরের মত এবং স্বীকৃত কোনো মতকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।

কেউ কেউ ইজমার প্রামাণ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এই যুক্তিতে যে, ইজমা একটি অসম্ভব ব্যাপার। তারা অধিকন্তু এই দাবির পেছনে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহর একটি আংশিক বক্তব্যকে উপস্থাপন করে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি ইজমার দাবি করল, সে মিথ্যাবাদী।'[১২৯]

মূলত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ মৌলিকভাবে ইজমাকে প্রত্যাখ্যান করেননি। তিনি নির্দিষ্ট একটি প্রেক্ষাপটে এই কথা বলেছিলেন। নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে মুতাজিলা ফিরকার ইজমার দাবির বিরুদ্ধে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ এই কথাটি বলেছিলেন। পুরো বক্তব্য থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার বক্তব্যের মর্ম ছিল এরকম যে, উক্ত বিষয়ে যে ব্যক্তি ইজমার দাবি করবে, সে মিথ্যাবাদী। কারণ এই বিষয়টিতে মানুষের মাঝে ইখতিলাফ আছে। এই বিষয়ে ইজমার দাবি ছিল বিশর আল মুরাইসি ও আসমের।[১৩০] আর বিশর ও আসম ছিল ইমাম আহমাদের যুগে মুতাজিলা ও বিদআতিদের নেতা।

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলি রহিমাহুল্লাহ শরহে তিরমিজির শেষে বলেন, 'যে ব্যক্তি ইজমার দাবি করবে, সে মিথ্যাবাদী।' ইমাম আহমাদের এই বক্তব্য মুতাজিলা ফকিহদের বিরুদ্ধে ছিল। তারা নিজেদের মতের ওপর ইজমার দাবি করত।

নিতে পারবে—বিষয়টি এমন নয়। এর জন্য ইলমের কোন স্তরে যাওয়া প্রয়োজন, তা উম্মাহর আলেমগণ আলোচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে একজন সাধারণ মানুষ ও একজন কুরআন-সুন্নাহর শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জনকারী ফকিহ বা মুজতাহিদ কখনোই সমান নয়।

১২৯. মাসায়েলে আহমাদ বিন হাম্বল, আল মাকতাবুল ইসলামিয়্যু, পৃষ্ঠা ৪৩৮

১৩০. আল উদ্দাহ ফি উসুলিল ফিকহি, ৪/১০৫৯

অথচ তারা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িদের আকওয়ালের ব্যাপারে সবচেয়ে কম জ্ঞান রাখত।[১৩১]

ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহও এ ধরনের মত পেশ করেছেন।[১৩২]

অর্থাৎ ইজমা সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে প্রমাণিত দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ইজমার প্রামাণ্যতা এবং তা সংগঠিত সম্ভব হওয়ার ওপরও সব যুগের আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ইমামরা একমত। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আলেমরা যে বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, সে ব্যাপারে কোনো সাধারণ মানুষ, শুদ্ধ দলিলবিহীন ভিন্ন দলিল প্রদানকারী আলেম এবং বাতিল ফিরকার আলেমদের মতবিরোধ ইজমার প্রামাণিক অবস্থানকে নষ্ট করবে না। কোনো বিষয় মুখতালাফ ফিহি (মতবিরোধপূর্ণ) হওয়ার জন্য অবশ্যই যোগ্য ও আহলুস সুন্নাহর কারও মতবিরোধ এবং তার পেছনে বিশুদ্ধ দলিল লাগবে।[১৩৩]

১৩১. আত তাহবির শরহুত তাহরির ফি উসুলিল ফিকহ লিল মারদাওয়ি, মাকতাবাতুর রুশদ, ৪/১৫২৮

১৩২. মুখতাসারু সাওয়ায়িকিল মুরসালাহ, পৃষ্ঠা ৫৮৩

১৩৩. এজন্য জমহুর উসুলবিদরা ইজমার জন্য সকল মুজতাহিদ আলেম একমত হওয়া ও ইজমার পেছনে মুসতানিদ দলিল তথা বিশুদ্ধ দলিল থাকাকে শর্ত করেছেন। সুতরাং যে শর্তের মাধ্যমে ইজমা সংগঠিত হয়, বিপরীতে সে শর্তের অনুপস্থিতিতে (অর্থাৎ মুজতাহিদ না হওয়া এবং বিশুদ্ধ দলিল না থাকা) কারও অবস্থান ইজমাকে প্রশ্নবিদ্ধকারীও হতে পারবে না। ফলে ইজমা সংগঠিত হওয়ার সময় কারও বুঝের ভুল কিংবা গ্রহণযোগ্য দলিলহীন বিচ্ছিন্ন অবস্থান ইজমাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে না। ইজমার মধ্যে বাধা সৃষ্টি হওয়ার জন্য ব্যক্তি একই সাথে মুসলিমদের মাঝে গ্রহণযোগ্য মুজতাহিদ ও বিশুদ্ধ দলিলের অধিকারী হতে হবে।

দ্বিতীয় সংশয় : মতবিরোধ ও ফাহমুস সালাফ

সালাফদের ভেতরও তো নুসুস বোঝার ক্ষেত্রে মতবিরোধ হয়েছে; বরং তাদের কারও কারও বোঝায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুলও হয়েছে। কেউ কেউ ইসরাইলি বর্ণনাও গ্রহণ করেছেন। সুতরাং নুসুসে শরিয়াহ বোঝার ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে তাদের ওপর নির্ভরশীলতাকে চাপিয়ে দিতে পারি?

নিরসন :

প্রথমত, আমরা পূর্বেও বলে এসেছি যে, সালাফরা মানুষ হিসেবে নিষ্পাপ নন। তাদের ভেতর কোনো বিষয়ে মতবিরোধ হওয়া সম্ভাব্য বিষয়। আবার তাদের কারও কারও বুঝ ভুলের শিকার হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, যে ব্যাপারে সালাফরা একমত হয়ে গেছেন, কেউ ইখতিলাফ করেননি বা কারও থেকে ইখতিলাফ প্রমাণিত নেই, সে ব্যাপারে তারা নির্ভুল।

তবে যে ব্যাপারে সালাফদের ভেতর গ্রহণযোগ্য মতবিরোধ তৈরি হয়েছে, সেখানে আমাদের চিন্তাভাবনার সুযোগ আছে। আর এ সুযোগটা এমন যে, পর্যালোচনার পর যে মতটা দলিলের দিক থেকে অধিক শক্তিশালী মনে হবে, সেটাকে গ্রহণ করে নেওয়া হবে। প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ কিংবা কারও স্বার্থ বা সন্তুষ্টি লাভের জন্য সুবিধাজনক মত বেছে নেওয়ার সুযোগ নেই। দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তিকে শরিয়াহর অনুসারী বলা যায় না; বরং ইমামরা এই শ্রেণির মানুষকে প্রবৃত্তি পূজারি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

দ্বিতীয়ত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের শব্দাবলির সাথে সাথে সাহাবিদেরকে কুরআনের মর্মও বুঝিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

بِالْبَيِّنٰتِ وَ الزُّبُرِ ؕ وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

‘সে রাসুলদেরকে উজ্জ্বল নিদর্শন ও আসমানি কিতাব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। (হে নবি!) আমি তোমার প্রতিও এই কিতাব নাজিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের সামনে সেই সব বিষয়ের ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা করে।’[১৩৪]

যেকোনো বক্তব্যের উদ্দেশ্য কেবল শব্দ শেখা নয়; বরং এর মর্ম বোঝাই প্রধান উদ্দেশ্য। এজন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের কাছে বিধানগতভাবে কুরআনের মর্ম পরিপূর্ণ পরিষ্কার করে গেছেন। যেন কুরআনের কোনো বিধান উম্মতের কাছে অস্পষ্ট না থাকে।

যার দরুন কুরআনের তাফসির নিয়ে সাহাবিদের মাঝে মতবিরোধ খুবই অল্প। এরপর তাবেয়িদের মাঝে যদিও সাহাবিদের তুলনায় একটু বেশি ছিল, কিন্তু তাদের পরবর্তীদের তুলনায় অল্পই ছিল। অর্থাৎ যে যুগ যত শ্রেষ্ঠ ছিল, সে যুগে ঐক্য, মিল, ইলম, সুস্পষ্ট বক্তব্য তত বেশি ছিল।[১৩৫]

আর তাবেয়িরা সাহাবায়ে কেরাম থেকে সুন্নাহর ইলমের পাশাপাশি তাফসিরের ইলমও অর্জন করেছেন। এমনকি এমনও তাবেয়ি আছেন, যিনি পুরো কুরআনের তাফসির সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে শিখেছেন। যেমন প্রখ্যাত তাবেয়ি মুফাসসির মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আমি সুরা ফাতেহা থেকে একদম শেষ পর্যন্ত পুরো কুরআন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কাছে তিন বার পড়েছি। আমি প্রত্যেক আয়াতে থেমে যেতাম এবং আয়াত সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে জিজ্ঞেস করে নিতাম।’[১৩৬]

---

১৩৪. সুরা নাহল, আয়াত ৪৪

১৩৫. মুকাদ্দামাতুন ফি উসুলিত তাফসির, ৩৫-৩৭

১৩৬. তাফসিরে তাবারি, ২/৫২৪

তৃতীয়ত, সালাফদের মাঝে আমরা যেসব ইখতিলাফ দেখতে পাই, সেগুলোর অধিকাংশই ইখতিলাফে তানাউ (বৈচিত্রপূর্ণ মতভিন্নতা), ইখতিলাফে তাজাদ (বিরোধপূর্ণ) নয়। যেমন হতে পারে, তারা একটি বিষয়কেই ভিন্ন ভিন্ন শব্দে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সবমিলিয়ে তাদের মর্ম একই।

অথবা তাদের কেউ দৃষ্টান্ত ও ধরন হিসেবে একটি জিনিস ব্যক্ত করেছেন, যেখানে তাদের অপরজন আরও একটি দৃষ্টান্ত ও ধরন ব্যক্ত করেছেন।

অথবা তাদের একজন আয়াতের একটি শানে নুজুল বর্ণনা করেছেন, অন্যজন ভিন্ন আরেকটি কারণ উল্লেখ করেছেন, যা প্রথমটির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আবার হতে পারে উভয়ের বর্ণনা করা শানে নুজুলই সঠিক, আয়াতটি দুবার অবতীর্ণ হয়েছে।

চতুর্থত, যেসব ক্ষেত্রে সালাফদের মাঝে ইখতিলাফে তাজাদ তথা বিরোধপূর্ণ মতভিন্নতা দেখা গিয়েছে, সেসব বিষয় খুবই অল্প, এবং দেখা যাবে তাদের এই মতবিরোধ দীনের মৌলিক বা সুপ্রমাণিত কোনো বিষয় নিয়ে নয়। সুতরাং শাখাগত ইখতিলাফের দোহাই দিয়ে মৌলিক ও সুপ্রমাণিত বিষয়ে তাদের ফাহম ও মানহাজকে প্রত্যাখ্যান করা সঠিক নয়।

তা ছাড়া যেসব বিষয়ে শরয়ি কোনো নস নেই। ইজতিহাদি বিষয় হওয়ার কারণে সমস্ত নস ও মাকাসিদে শরিয়াহর আলোকে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে, এমন বিষয়েও সালাফদের মতামত আমাদের থেকে উত্তম, যদি সে মতামতের বিরুদ্ধে তাদের কারও মন্তব্য না পাওয়া যায়। ইমাম শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তারা বিবেক, ইলম, কল্যাণ ও এমন সকল বিষয়ে আমাদের থেকে ঊর্ধ্বে, যার মাধ্যমে ইলম অর্জন করা যায় এবং সঠিককে উপলব্ধি করা যায়। আমাদের জন্য তাদের সিদ্ধান্ত নিজেদের সিদ্ধান্তের চেয়েও কল্যাণকর।'[১৩৭]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহর মূলনীতি হলো, যখন সাহাবিদের মতবিরোধ সামনে আসবে, তখন তাদের যে মতটি কুরআন-সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী, সে মতটিকে গ্রহণ করে নেওয়া হবে। তবে তাদের বক্তব্যসমূহ থেকে বের হওয়া যাবে না।[১৩৮]

---

১৩৭. মানাকিবুশ শাফেয়ি, পৃষ্ঠা ৪৯

১৩৮. ইলামুল মুয়াক্কিয়িন, ১/৩১

সালাফদের কেউ কেউ যেসব ইসরাইলি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, সেগুলো নুসুসে শরিয়াহর ফাহমের সূত্রে নয়; বরং এসব রেওয়ায়েত তারা আহলে কিতাবদের থেকে বক্তব্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর এই ক্ষেত্রে হাদিসে নববির নির্দেশনা হলো,

لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا.

'তোমরা আহলে কিতাবদের সত্যায়নও করো না, আবার অস্বীকারও করো না; বরং বলো, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং তিনি আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তার প্রতি ঈমান এনেছি।'[১৩৯ ১৪০]

ইসরাইলি রেওয়ায়েত মূলত তিন প্রকার

১. যার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর সমর্থন পাওয়া যায়। এ ধরনের বর্ণনা গ্রহণ করতে সমস্যা নেই।

২. যার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর অস্বীকৃতি পাওয়া যায়। এ ধরনের বর্ণনা গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই।

৩. যার স্বীকৃতি কিংবা অস্বীকৃতি কোনোটাই কুরআন-সুন্নাহতে পাওয়া যায় না। এ ধরনের বর্ণনাকে হাদিসের নির্দেশনা মোতাবেক অস্বীকারও করা হবে না, আবার সত্যায়নও করা হবে না। এ ক্ষেত্রে নিরব থাকাই উত্তম।[১৪১]

---

১৩৯. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৪৪৮৫

১৪০. ইসরাইলি রেওয়াত বা ইসরাইলিয়্যাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইহুদি ও নাসারাদের সূত্রে প্রাপ্ত বর্ণনাবলি, যা তাদের ধর্মগ্রন্থ কিংবা আরবের ইহুদি ও নাসারাদের সমাজে প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে এসেছে। ইসরাইলি রেওয়াত মূলত তিন প্রকার। লেখক এখানে হাদিসে নববির যে নির্দেশনা উল্লেখ করেছেন, তা মূলত তৃতীয় প্রকারের (যে ইসরাইলি রেওয়াতের সত্য-মিথ্যা হওয়ার কোনো দিকই দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়) ব্যাপারে প্রযোজ্য।

১৪১. উলুমুল কুরআন, মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ, পৃষ্ঠা ৩৪৫-৩৪৬

তৃতীয় সংশয় : ইজতিহাদ ও ফাহমুস সালাফ

সালাফদের ফাহম আঁকড়ে ধরা জুমুদের (স্থবিরতা ও অনাগ্রসতার) দিকে ঠেলে দেয়, ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে দেয় এবং নাওয়াজেলের (নতুন নতুন পরিস্থিতির) বিধান বের করার পথকে রুদ্ধ করে দেয়।

নিরসন :

প্রথমত, ফাহমুস সালাফকে অক্ষুণ্ণ রাখলে মুসলিমদের চিন্তায় স্থবিরতা চলে আসে, ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, নতুন পরিস্থিতিতে শরিয়াহর বিধান ইসতিমবাত (উদ্‌ঘাটন) করা যায় না ইত্যাদি ধারণা ও দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই আপত্তি যারা করে, তারা সালাফদের ফাহম ও মানহাজ সম্পর্কে হয়তো অজ্ঞ নতুবা অজ্ঞতার ভান ধরা কেউ। ইজতিহাদ আমাদের সালাফদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। তারা উম্মাহকে নুসুসে শরিয়াহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করে নিজেদের জীবনে শরিয়াহ্ বাস্তবায়নের জন্য তাগিদ দিয়েছেন। যেকোনো ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ পরিত্যাগ করে দলিল ও মূলনীতির আলোকে আলেমদের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, মানসুস আলাইহি নয় (নসবিহীন) এমন বিষয়ে সুশৃঙ্খল ইজতিহাদ ইসলামি শরিয়াহর একটি অপরিহার্য বিষয়।[১৪২] বান্দার ওপর থেকে তাকলিফ

---

১৪২. যে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহতে কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায় না এবং যে বিষয়ে পূর্ববর্তী ইমাম

(আহকামে শরিয়াহর বাধ্যবাধকতা) উঠে যাওয়ার আগ পর্যন্ত উম্মাহর জন্য ইজতিহাদ ওয়াজিব। আর কিয়ামত ছাড়া বান্দার ওপর থেকে তাকলিফ উঠিয়ে নেওয়া হবে না। শরিয়াহ আমাদেরকে পর্যাপ্ত শরয়ি প্রিন্সিপাল বা মৌলিক বিধান ও উসুল প্রদান করেছে, তবে সেগুলো সীমাবদ্ধ। আর কিয়ামত পর্যন্ত চলমান ঘটনাপ্রবাহ সীমাহীন। সুতরাং শরিয়াতের সীমাবদ্ধ জাওয়াবেত (মূলনীতি) ও মৌলিক বিধান অনুযায়ী সীমাহীন এই ঘটনাগুলোতে ইজতিহাদ আবশ্যক। এই ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ছাড়া বান্দার ওপর শরিয়াতের যে তাকলিফ রয়েছে, তা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। অথচ মৃত্যু বা কিয়ামত সংগঠিত হওয়া ছাড়া বান্দার ওপর থেকে তাকলিফও (আহকামে শরিয়াহর বাধ্যবাধকতা) বাতিল হবে না। আল্লামা শাতেবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'বাস্তবে নবউদ্ভাবিত মাসায়েল সীমাহীন। সুতরাং সীমাবদ্ধ দলিলের ভেতর সীমাহীন ঘটনাপ্রবাহকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া সঠিক নয়। এজন্য ইজতিহাদ ও কিয়াসের দরজা খোলা রাখা প্রয়োজন।'[১৪৩]

শরিয়াতের যাবতীয় বিধান পালনের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য মহান রহস্য হলো পরীক্ষা। বান্দাকে পরীক্ষার জন্য মহান আল্লাহ তাআলা শরিয়াতের বিধিবিধান দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। ইজতিহাদের ক্ষেত্রেও একটি রহস্য হলো বান্দার ওপর পরীক্ষার এই ধারা বহাল রাখা। যেমন ইমাম শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইজতিহাদের ক্ষেত্রে বান্দাদের আনুগত্য পরীক্ষা করা হয়, যেমন শরিয়াতের অন্যান্য ফরজ বিধানের আনুগত্যে তাদের পরীক্ষা করা হয়।'[১৪৪]

ও ফকিহদের সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায় না, এমন নতুন বিষয়ে দীনি বিধান বের করার জন্য শরয়ি নীতিমালার আলোকে যোগ্য ব্যক্তির গবেষণাকে 'ইজতিহাদ' বলে। এজন্য যেকোনো ক্ষেত্রে যে-কেউ ইজতিহাদ করার অধিকার রাখে না। ইজিতিহাদযোগ্য বিষয় হতে হলে অবশ্যই সেটা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং পূর্ববর্তী ফুকাহায়ে কেরামের সুস্পষ্ট নির্দেশনামুক্ত নব্য বিষয় হতে হবে। সাথে সাথে যিনি ইজতিহাদ করবেন তাকেও বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। যেমন বিধিবিধান সংবলিত আয়াত ও হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান থাকা, ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা, কিয়াসের নীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়া, নাসেখ মানসুখের ব্যাপারে পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া, আরবি ভাষায় পারদর্শী হওয়া, উলুমে হাদিসের ইলম থাকা, গবেষণা চিন্তাভাবনার যোগ্যতা থাকা, আদালাত তথা ন্যায়বান হওয়া। এ ছাড়াও ইজতিহাদের বিভিন্ন প্রকার আছে। যেগুলো উসুলে ফিকহের গ্রন্থগুলোতে আলোচিত হয়েছে।

১৪৩. আল মুওয়াফাকাত, ১/১০৪

১৪৪. আর রিসালাহ, পৃষ্ঠা ২২

যদি ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে নতুন আপতিত পরিস্থিতিতে ইসলামের বিধান বের করার পথও বন্ধ হয়ে যাবে। অন্যদিকে বান্দা প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়াহর দিকনির্দেশনা মেনে চলতে বাধ্য। শরিয়াহ মানার এই বাধ্যবাধকতাকেই তাকলিফ বলে। এখন নতুন এই পরিস্থিতিতে শরিয়াতের বিধান জানতে না পারার কারণে বান্দার ওপর তাকলিফের বাস্তবায়ন সম্ভব না। যা ইসলামি শরিয়াহর গতিশীলতা এবং কিয়ামত পর্যন্ত এর উপযোগিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। সুতরাং ইজতিহাদ বন্ধের দাবি তোলার কোনো সুযোগই নেই। আমাদের সালাফরাও কখনো ইজতিহাদের দরজা বন্ধের কথা বলেননি। তা ছাড়া সালাফদের ফাহম ও মানহাজ আঁকড়ে ধরাও কখনো ইজতিহাদের পথকে রুদ্ধ করে না; বরং তারা খালাফদের জন্য ইজতিহাদের পথকে সুগম ও নিরাপদ করে গেছেন।

তৃতীয়ত, ইজতিহাদ একটি দুধারি তরবারি। ইজতিহাদকে তার সীমার ভেতর সঠিক পথে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে, তা আমাদের ফিকহি ভাণ্ডারে এমন কিছু বিষয় সংযোজন করতে পারে, যা উম্মাহর জন্য কল্যাণকর ও গর্বের বিষয় হবে। কিন্তু ইজতিহাদের হাতিয়ারকে ভুল পথে ব্যবহার করলে, কিংবা অযোগ্য ব্যক্তির হাতে ব্যবহৃত হলে, তা দীন বিকৃতির এক আন্দোলনে রূপ নেবে। যেমন বর্তমানে অনেকেই ইজতিহাদের নামে আমাদের ঐতিহ্যবাহী ফিকহি ভাণ্ডারের অনেক ঐকমত্যপূর্ণ, স্বীকৃত কিংবা ফায়সালাকৃত মাসআলাকে ক্ষতবিক্ষত করছে। সুদ, মদ, গানবাদ্য হারাম নয়, ফ্রি-মিক্সিং বৈধ, হুদুদ পরিবর্তনযোগ্য, ইকদামি জিহাদ বাতিল ইত্যাদি ভ্রান্ত মতামত কথিত ইজতিহাদের নামেই তৈরি হচ্ছে। ইজতিহাদের ওপর সওয়ার হয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার সকল মহামারি ও অভিশাপকে হালালকরণের প্রচেষ্টা চলছে। দীনকে বিকৃত করার অসংখ্য কর্মকাণ্ড চলে আসছে এই ইজতিহাদকে ভিত্তি করেই।

এ কারণেই ইজতিহাদ দুধারি তরবারির মতো। সঠিক ব্যবহার হলে উম্মাহর ব্যাপক কল্যাণ সাধিত হবে। আর ভুল ব্যবহার হলে উম্মাহর সামনে বিভ্রান্তির হাজারো দুয়ার উন্মোচন হবে।

কেউ কেউ মনে করেন, ইজতিহাদ মানে হলো নিজের আকল ও বুঝের ওপর নির্ভর করে নুসুসে শরিয়াহর ওপর যেকোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করা। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। নিজের আকল ও বুঝের ভিত্তিতে ইসলামি শরিয়াহ সম্পর্কে কোনো

সিদ্ধান্ত গ্রহণের নাম ইজতিহাদ নয়। যে হাদিসের মাধ্যমে ইজতিহাদের দরজা উন্মোচন করা হয়েছে, সে হাদিসের প্রতি আমরা লক্ষ করলে বিষয়টা ভালো করে বুঝে আসবে। হজরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, কোনো বিষয় কুরআনে না থাকলে কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবে? হজরত মুয়াজ রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, সুন্নাতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, যদি সুন্নাতেও না পাও তাহলে কী করবে? তিনি বললেন, আপন বিবেক খাটিয়ে ইজতিহাদ করব এবং এ ব্যাপারে কোনো কমতি করব না।[১৪৫] এই হাদিসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরআন ও সুন্নাহতে যে ব্যাপারে নির্দেশনা রয়েছে, সে ব্যাপারে ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই। কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত নির্দেশনার পরও কেউ যদি ইজতিহাদ করে, তবে সেটা ইজতিহাদ হবে না, তাহরিফ (বিকৃতি) বা তাবদিল (পরিবর্তন) হবে।

কুরআন-হাদিসে সুস্পষ্ট নির্দেশনার ব্যাপারেও ইজতিহাদের অনুমোদন দেওয়া হলে নবি-রাসুল প্রেরণের কোনো দরকার ছিল না। নবি-রাসুল এসেছেনই মানুষকে ওহির মাধ্যমে সঠিক পথ দেখাতে। কারণ সার্বিকভাবে মানুষের আকল সবসময় ও সবকিছুতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম নয়। যদি কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন-সুন্নাহর ওপর আমল করার বাধ্যবাধকতাই না থাকত, তাহলে মহান আল্লাহ তাআলা সবকিছুতে এত সুস্পষ্টভাবে ইসলামের নির্দেশনা প্রদান করতেন না; বরং বলে দিতেন, প্রত্যেক যুগের মানুষ নিজের বিবেক দিয়ে যা ভালো ও কল্যাণকর মনে করবে, সেটাই শরিয়াহর বিধান, সে অনুযায়ীই তারা জীবন পরিচালনা করবে।

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে আরেকটি প্রবণতা হলো, কেউ কেউ প্রথমোক্ত শ্রেণির মতো নিজের বিবেক-প্রসূত সিদ্ধান্তকে ইজতিহাদের নামে চালিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী নয়। কিন্তু ইজতিহাদের নামে তাদের আচরণ দেখলে মনে হবে, কুরআন-সুন্নাহ যেন কেবল আজই অবতীর্ণ হলো। বিগত চৌদ্দশ বছর কুরআন-সুন্নাহর ওপর কোনো কাজ হয়নি। তাই মেধা-বুদ্ধি খাটিয়ে আমাদের এখন একদম নতুন করে নুসুসে শরিয়াহর ব্যাখ্যার কাজে লেগে পড়তে হবে!

---

১৪৫. সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং ৩৫৯২; সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ১৩২৭

অথচ আমরা এমন এক যুগ পার করে এসেছি, যে সময়ের মাঝে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ি, তাবে-তাবেয়ি এবং উম্মাহর আইম্মারা অতিবাহিত হয়েছেন। যারা নিজের পুরো জীবন ব্যয় করেছেন এই দীনের ইলমের জন্য। কুরআন-সুন্নাহ বোঝা ও তার ওপর আমল করার জন্য তারা এমন ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন, যার কল্পনাও আমরা করতে পারি না। তারা সারা জীবন ত্যাগ ও সাধনার মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য রেখে গেছেন ইসলামি শাস্ত্রসমূহের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার। তাদের এই ইলমের ভাণ্ডারকে ছুড়ে ফেলে আমরা যদি নতুন করে ইজতিহাদ ও ইসতিমবাতের দাবি করি, সেটা আমাদেরকে কুরআন-সুন্নাহ থেকে বহু দূরে নিক্ষেপ করবে। এই দাবির অর্থ দাঁড়ায়, চৌদ্দশ বছর ধরে কুরআন-সুন্নাহর ওপর কোনো আমল হয়নি। দীর্ঘ এই সময়ে পুরো উম্মত কুরআন-সুন্নাহর বুঝ থেকে বঞ্চিত ছিল। মাআজাল্লাহ। এমন দাবি ইসলামকে অবমাননা করার শামিল। মহান আল্লাহ তাআলা কুরআন-সুন্নাহকে প্রেরণ করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত তা চলমান থাকার জন্য। এখন মাঝখানে দীর্ঘ চৌদ্দশ বছর কি কুরআন-সুন্নাহ বিলুপ্ত ছিল? এমন দাবি কি আল্লাহর বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে না?

আবার কেউ কেউ আছেন ফিকহের অধিকাংশ সিদ্ধান্তকেই ইজতিহাদের মাধ্যমে পরবির্তনযোগ্য মনে করেন। ইসলামি বিধানসমূহের দুটি স্তর আছে। একটি স্তর হলো, তাওয়াতুর সূত্রে প্রমাণিত আহকাম, যেগুলোকে কতইয়্যাত (তথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত) বলে। আরেকটি স্তর হলো, জন্নিসূত্রে প্রমাণিত আহকাম, যাকে জন্নিয়্যাত বলা হয়।[১৪৬] আমলের দিক থেকে উভয় প্রকার বিধানই এক। বিশ্বাসের দিক থেকে সামান্য পার্থক্য আছে। একটা দৃঢ় বিশ্বাস, আরেকটা প্রবল বিশ্বাস।

উভয় প্রকার বিধানই শরয়ি নস দ্বারা প্রমাণিত। এখানে সন্দেহ কিংবা ইজতিহাদের

---

১৪৬. হাদিসে মুতাওয়াতির বা খবরে ওয়াহেদ এগুলো ইলমি পরিভাষা। এসব পরিভাষার ভাষান্তর করার সময় দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে এর পরিপূর্ণতা থাকে না। তবে মূল বক্তব্য বোঝার স্বার্থে এতটুকু বলা যায় যে, মুতাওয়াতির হলো এমন হাদিস বা খবর, যা সনদের প্রতি স্তরেই এমন সংখ্যক রাবি কর্তৃক বর্ণিত, স্বাভাবিকভাবে যাদের মিথ্যার ওপর একমত হওয়া অসম্ভব। অপরদিকে যে হাদিসের বর্ণনা মুতাওয়াতিরের শর্তে উন্নীত নয়, সেগুলো খবরে ওয়াহেদ। মুতাওয়াতির হাদিস কতইয়্যাত বা দৃঢ়তার ফায়দা দেয়। আর খবরে ওয়াহেদ জন্নিয়্যাত তথা প্রবল বিশ্বাসের ফায়দা দেয়। তবে শরিয়াতের বিধান দুই প্রকার হাদিস থেকেই প্রমাণিত ও আবশ্যক হয়।

সুযোগ নেই। কতইয়্যাতের মতো জন্নিয়্যাতও প্রতিষ্ঠিত শরয়ি বিধান, যা মানা ও অনুসরণ করা আবশ্যক। এটাকে জন্নি হিসেবে নামকরণ কেবল পারিভাষিক ব্যাপার। জন্নি নামকরণের মানে এই নয় যে, বিষয়টি শরিয়াহর বাইরের অনাবশ্যক বিষয় কিংবা সন্দেহযুক্ত।[১৪৭]

কিন্তু মুতাজিলাদের মতো মডার্নিস্ট মুসলিমরা ইজতিহাদের নামে সকল জন্নি আহকাম পরিবর্তনযোগ্য মনে করে। ইসলামি শরিয়াহর অধিকাংশ বিধান খবরে ওয়াহিদ সূত্রে প্রমাণিত। যদি এই সকল বিধানকে ইজতিহাদি বলে পরিবর্তন করা শুরু হয়, তবে শরিয়াহর কিছুই থাকবে না। অথচ কিতাবুল্লাহ ও মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং শরিয়াহর যেসব খবরে ওয়াহিদ ফুকাহায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসিনে কেরামের ঐকমত্যে গ্রহণযোগ্য হয়েছে, সেগুলো দীনের প্রতিষ্ঠিত বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এসব বিধানে পরিবর্তন সাধনের কোনো সুযোগ নেই।[১৪৮]

পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমানে কেউ কেউ এমন সব বিধান পরিবর্তনের কথা বলে, যা দীনের সাওয়াবেত (ثَوَابِت) তথা সুপ্রমাণিত বিধানের অন্তর্ভুক্ত। যেগুলোতে পরিবর্তন সাধনের কোনো সুযোগ নেই। যেমন : যিনার হদ রজমকে অস্বীকার করা, মুরতাদের হদকে অস্বীকার করা। এ ধরনের আরও অনেক বিধান আছে, যেগুলো সুস্পষ্ট নস এবং উম্মাহর ইজমার ভিত্তিতে প্রমাণিত। কিন্তু কিছু মানুষ এই বিধানগুলোকে পরিবর্তনযোগ্য বলে দাবি করছে। এটি নিঃসন্দেহে আহকামে শরিয়াহর তাহরিফ ও শরিয়াহ থেকে পলায়নের নামান্তর।[১৪৯]

ওপরে উল্লেখিত ইজতিহাদের প্রতিটি ধারণা ও রূপই বাতিল। যা দীনে ইসলামকে বিকৃত করে যাচ্ছে এবং উম্মাহর জন্য নতুন নতুন ফিতনা তৈরি করছে।

ইজতিহাদের সঠিক অর্থ হলো, কুরআন-সুন্নাহ থেকে তাওয়ারুস সূত্রে আমরা যেসব মূলনীতি ও ফাহম লাভ করেছি, সেগুলোর আলোকে নতুন বিষয় ও উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধান খুঁজে বের করা। কারণ প্রত্যেক যুগেই এমন কিছু মাসআলা সৃষ্টি হয়, যার সুস্পষ্ট সমাধান আমরা কুরআন-সুন্নাতে পাব না এবং পূর্ববর্তী ফকিহদের ফিকহি ভাণ্ডারেও আমরা সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাব না। এ

---

১৪৭. মারেকাতুস নাস, পৃষ্ঠা ১৩২

১৪৮. মুহাযারাতে উসুলে ফিকহ, পৃষ্ঠা ৪১৩

১৪৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৪

ক্ষেত্রগুলোতে নুসুসে শরিয়াহ ও মাকাসিদে শরিয়াহর আলোকে সমাধান বের করার নামই ইজতিহাদ। এ ইজতিহাদের দরজা কেউ বন্ধ করেনি এবং সালাফদের ফাহম ও মানহাজ এ ধরনের বিশুদ্ধ ইজতিহাদের বিরোধী তো নয়ই; বরং এর প্রতি উৎসাহপ্রদানকারী।

সুতরাং ইজতিহাদের বৈধতা দেখিয়ে সালাফদের ফাহম ও মানহাজের ওপর প্রশ্ন তোলার আগে দেখতে হবে, আমাদের ইজতিহাদের পদ্ধতি ও সীমা ঠিক আছে কিনা। মূলত সালাফদের ফাহম ও মানহাজকে আঁকড়ে ধরার প্রয়োজনীয়তার একটি কারণ এটিও যে, কেউ যেন ইজতিহাদ বা গবেষণার নামে এই দীনের ব্যাপারে যা খুশি তা বলতে না পারে। শরিয়াহকে প্রত্যেক যুগের প্রবৃত্তি পূজারিরা যেন খেলনার পাত্রে পরিণত করতে না পারে। সারকথা হলো, সালাফদের ফাহম ও মানহাজ ইজতিহাদের পথকে বন্ধ করে না; বরং ইজতিহাদকে সঠিক ও নিরাপদ পথে পরিচালিত করে।[১৫০]

১৫০. এই প্রবন্ধটি ইসলাম আওর জিদ্দাত পছন্দি গ্রন্থের ইজতিহাদ নামক প্রবন্ধের আলোকে তৈরি করা হয়েছে।

চতুর্থ সংশয় : তাদাব্বুর ও ফাহমুস সালাফ

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে তাদাব্বুর (গভীর চিন্তাভাবনা) করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। সালাফদের ফাহমের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার আবশ্যিকতা আল্লাহর এই নির্দেশের বিরুদ্ধে যায়। কারণ তাদাব্বুর একটি সামগ্রিক বিষয়। হতে পারে, বর্তমানে কোনো মুতাদাব্বিরের (চিন্তাভাবনাকারীর) সামনে কুরআনের কোনো আয়াতের এমন মর্ম ও রহস্য উন্মোচিত হয়েছে, যেটা পূর্ববর্তী সালাফদের কারও কাছে উন্মোচিত হয়নি। শরিয়াহ কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে। এজন্য জরুরি হলো, শরিয়াহ নিয়ে চিন্তাভাবনা ও পর্যালোচনার দরজা বন্ধ না করে দেওয়া। যেন উম্মাহর সামনে এমন কোনো বিষয় উন্মোচিত হয়, যেটা পূর্ববর্তীদের সামনে হয়নি।

নিরসন :

প্রথমত, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.

'(হে রাসুল!) এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাজিল করেছি, যাতে মানুষ এর (আয়াতের) মধ্যে চিন্তা করে এবং বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে।'[১৫১]

---

১৫১. সুরা সাদ, আয়াত ২৯

এমনকি যারা কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর করে না, তাদের ব্যাপারে তিনি নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْاٰنَ أَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا.

'তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না, নাকি (তাদের) অন্তরে তালা লেগে আছে?'[১৫২]

وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّوْنَ.

'তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে নিরক্ষর, যারা কিতাব (তাওরাত)-এর কোনো জ্ঞান তো রাখে না, তবে কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা পুষে রেখেছে। তাদের কাজ কেবল এই যে, তারা অমূলক ধারণা করতে থাকে।'[১৫৩]

আয়াতসমূহের এই নির্দেশনার ফলেই সাহাবায়ে কেরাম কুরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন মর্ম ও রহস্য বের করার প্রতি মনোনিবেশ করেছেন, যেগুলো শরিয়াতের প্রবর্তকের পক্ষ থেকে মানসুস ছিল না। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, 'কুরআন হলো মহান আল্লাহর ভোজসভা। সুতরাং যত পারো আল্লাহর ভোজসভা থেকে ইলম লাভ করে নাও।' তিনি আরও বলেন, 'কুরআনের রহস্য কখনো শেষ হওয়ার নয়।'[১৫৪]

তাবেয়িরাও কুরআন থেকে এমন সব মর্ম ও রহস্য বের করে নিয়ে আসতেন, যেগুলো সাহাবায়ে কেরাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। তারা সাহাবায়ে কেরাম থেকে কুরআনের মৌলিক তাফসির শিক্ষা লাভ করেছেন। আবার মৌলিক তাফসিরের বাইরেও তারা কুরআনের আয়াত নিয়ে গবেষণা করেছেন। একই কথা হাদিসের ক্ষেত্রেও। তাদাব্বুরের মাধ্যমে তারা দীনের অনেক বুঝ ও রহস্য উম্মাহর সামনে নিয়ে এসেছেন।

সুতরাং এতে বোঝা যায়, সালাফদের বুঝ আঁকড়ে ধরার সাথে তাদাব্বুরের নির্দেশনার কোনো সংঘাত নেই। যদি দুটি ব্যাপার সাংঘর্ষিকই হতো, তাহলে তাবেয়িরাই সর্বপ্রথম তা অস্বীকার করতেন। অথচ বাস্তবতা হলো, সকল

---

১৫২. সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত ২৪

১৫৩. সুরা বাকারা, আয়াত ৭৮

১৫৪. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদিস নং ২০১৭; আযযুহদ, ইবনুল মুবারাক, ৮০৮

সালাফই সাহাবিদের ফাহমকে আঁকড়ে ধরার পাশাপাশি উম্মতকে অধিক পরিমাণে তাদাব্বুরের জন্য উৎসাহিত করেছেন। নুসুসে শরিয়াহ থেকে বিধান, মর্ম ও রহস্য উদঘাটন করার কথা বলেছেন। ইমাম বাগাভি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এক প্রকার ইলম হলো, যা কুরআন তিলাওয়াত ও তার অর্থের মাধ্যমে লাভ হয়। আরেক প্রকার ইলম হলো, যা চিন্তাভাবনা ও গবেষণার মাধ্যমে লাভ হয়। আর তা নুসুসের গভীরে গচ্ছিত মর্মের ওপর কিয়াস করার মাধ্যমে মুতাদাব্বিরের সামনে উন্মোচিত হয়।'[১৫৫]

(তবে এখানে খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে, যেন তাদাব্বুরকারীর তাদাব্বুর শরিয়াতের কোনো উসুল বা মৌলিক নির্দেশনার খেলাফ না হয়। সাহাবিগণ হয়ে যে দীন আমাদের কাছে এসেছে, সে দীনের সিদ্ধান্তকৃত কোনো বিষয়ের বিরুদ্ধে না যায় এবং শরিয়াতের অন্য কোনো নসের বিপরীত না হয়।)

দ্বিতীয়ত, সালাফদের ফাহম আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে তাদাব্বুর ও ইসতিমবাত বেশি সুশৃঙ্খল ও বিশুদ্ধ হয়। সালাফদের ফাহম আমাদের তাদাব্বুরকে সঠিক ও নিরাপদ পথে পরিচালিত করে। যেন কেউ তাদাব্বুর আর গবেষণার নামে আল্লাহ, তার রাসুল ও শরিয়াতের ব্যাপারে যা ইচ্ছা তা বলতে না পারে। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, যারাই কুরআন-হাদিসকে সালাফদের তাফসিরের বিপরীতে গিয়ে ব্যাখ্যা করেছে, তারাই আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলেছে, আল্লাহর আয়াতের এমন ব্যাখ্যা আবিষ্কার করেছে, যা শরিয়াতের বিরুদ্ধে যায় এবং তারাই আল্লাহর কালামের বিকৃতি ঘটিয়েছে। আর তারাই ইলহাদ ও যানদাকার (দীন ত্যাগ ও ঈমান বিধ্বংসী বিকৃতির) দরজা উন্মোচন করেছে।[১৫৬]

তৃতীয়ত, সালাফরা যে ফাহমের ওপর একমত পোষণ করেছেন এবং যে ফাহমের ক্ষেত্রে তাদের মতভিন্নতা দেখা যায় না, সে ফাহমকে অবশ্যই আঁকড়ে ধরতে হবে। আর যে ফাহমের ক্ষেত্রে তাদের ভেতর মতবিরোধ হয়েছে এবং সে মতবিরোধ বর্ণিত হয়ে এসেছে, সেখানে খালাফের যোগ্য ব্যক্তিদের অবকাশ আছে চিন্তাভাবনা ও পর্যালোচনা করে সবচেয়ে সঠিক ফাহমটি গ্রহণ করার।

চতুর্থত, আমাদের তাদাব্বুর ও ইসতিমবাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য সালাফদের ফাহম

১৫৫. মাআলিমুত তানযিল, ২/২৫৫
১৫৬. মাজমুউল ফাতাওয়া, ১৩/২৪৩

আঁকড়ে ধরা প্রধান শর্ত। সুতরাং তাদাব্বুরের জন্য সর্বপ্রথম জরুরি হলো, নুসুসে শরিয়াহর মৌলিক ও শুদ্ধ মর্ম জেনে নেওয়া। আর এই ক্ষেত্রে সালাফদের ফাহমই মৌলিকত্ব ও বিশুদ্ধতার দাবি রাখে। এজন্য উলামায়ে কেরাম তাদাব্বুরের জন্য কিছু নিয়ম ও শর্তাবলি বেঁধে দিয়েছেন। যেগুলো লক্ষ না রাখলে তাদাব্বুর ভুল পথে পরিচালিত হবে এবং ব্যক্তিকে চরম ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যাবে। আমরা এখানে মৌলিক কিছু শর্ত তুলে ধরছি—

১. উদঘাটিত অর্থ বা মর্ম সালাফের ফাহমের বিরোধী হতে পারবে না। কারণ এতে করে সকল সালাফের ওপর দীন না বোঝার মতো মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়। তারা ভ্রান্তি ও মূর্খতার ওপর একমত হয়েছেন—এ ধরনের জঘন্য দাবি করা হয়। আর এ ধরনের দাবি সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যাত।

তাদাব্বুর ও ইসতিমবাত যেহেতু আয়াতের সঠিক অর্থ জানার ওপর নির্ভরশীল, এজন্য উদঘাটিত মর্মও সালাফের মৌলিক ও শুদ্ধ ফাহমের সাথে বিরোধহীন হতে হবে। পাশাপাশি সালাফের ফাহম ও উদঘাটিত নতুন ফাহমের মাঝে পরস্পর সম্পর্ক বা যোগসূত্র থাকতে হবে। ইমাম কুরতুবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তাফসির করতে গেলে প্রাথমিকভাবে নসের সাধারণ ও বাহ্যিক যে ফাহম রয়েছে, সেটা নিয়ে আসতে হবে। এর জন্য নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সালাফের কোনো বর্ণনা অবলম্বন করতে হবে। পাশাপাশি কোনো উসতাজ বা শায়খ থেকেও এ ব্যাপারে শোনার আশ্রয় নিতে হবে। এতে করে আশা করা যায়, সে প্রথমেই ভুলের ময়দান থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। অতঃপর এর ওপর ভিত্তি করে তাফসিরের গভীরে প্রবেশ করতে পারবে। নিজস্ব ফাহম ও ইসতিমবাত আরও প্রশস্ত করতে পারবে। সুতরাং বাহ্যিক তাফসির জানার পূর্বে গভীর মর্মে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।'[১৫৭]

কারণ যে ব্যক্তি দাবি করে যে, মৌলিক তাফসির জানার আগেই সে কুরআনের গভীর রহস্যে পৌঁছে গেছে, সে মূলত ওই ব্যক্তির মতো, যে দরজায় প্রবেশের আগেই ঘরের ভেতরে চলে যাওয়ার দাবি করে।[১৫৮] আর নুসুসে শরিয়াহর মৌলিক, বাহ্যিক ও বিশুদ্ধ তাফসির সেটিই, যা সালাফরা বুঝেছেন।

---

১৫৭. আল জামিউ লি আহকামিল কুরআন, ১/৫৯
১৫৮. আল ইতকান লিস সুয়ুতি, ২/২৬৭

২. উদঘাটিত মর্ম আরবি ভাষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। কারণ আরবি ভাষা শরিয়াতের প্রধান ও মৌলিক ভাষা। ইমাম শাতেবি রহিমাহুল্লাহ এটাকে প্রথম শর্তের স্থানে রেখেছেন। তিনি বলেন, 'কুরআন থেকে উদঘাটিত যে মর্ম আরবি ভাষার প্রচলনে নেই, উলুমে কুরআনে এর কোনো স্থান নাই। সেটা এমন কোনো বিষয় হিসেবে গৃহীত হবে না, যার মাধ্যমে উপকার লাভ করা যায়, কিংবা কাউকে উপকৃত করা যায়। যে এটাকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে দাবি করবে, সে তার দাবিতে মিথ্যাবাদী হবে।'[১৫৯]

৩. নতুন উদঘাটিত মর্মের পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর সমর্থন থাকতে হবে। এটা ইমাম শাতেবি রহিমাহুল্লাহর কাছে দ্বিতীয় শর্ত।

ওপরের শর্তসমূহের ভিত্তিতে বলা যায়, নুসুসে শরিয়াহর এমন নতুন মর্ম আবিষ্কার করা যায়, যা সালাফদের থেকে বর্ণিত নয়। তবে এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে—

১. যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে সালাফদের ফাহমের সাথে বিরোধহীন মর্ম উদঘাটন, যার মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের ওপর দীন না বোঝার অপবাদ আরোপিত হয় না, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ এই কুরআনের রহস্য শেষ হবার নয়।

অনুরূপ আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও মহান আল্লাহ তাআলা জামিউল কালিম দান করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমরা নুসুসে শরিয়াহ থেকে নিত্য নতুন রহস্য ও গভীর মর্ম উদঘাটন করতে থাকবে। এটি মহান আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তাকে দান করে থাকেন। পবিত্র কুরআন হলো প্রবাহমান নদীর মতো। এই নদী থেকে আল্লাহর নির্ধারিত অংশ অনুযায়ী প্রত্যেকেই মনিমুক্তা আহরণ করতে থাকবে।

২. আর যদি এর দ্বারা সালাফদের ফাহমের বিরোধী কোনো মর্ম উদঘাটনের দাবি করা হয়, তবে সে মর্ম গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং প্রত্যাখ্যাত হবে। কারণ এর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ যুগের মানুষ সালাফদের ওপর ভ্রান্তি ও অজ্ঞতার মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা হয়। অথচ দীনের বুঝ, ফিকহ, আমল সবক্ষেত্রে তারা শ্রেষ্ঠত্বের সার্টিফিকেট অর্জনকারী প্রজন্ম। আবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মত ভ্রান্তির ওপর একমত হবে না।' সুতরাং সালাফদের

---

১৫৯. আল মুওয়াফাকাত, দারু ইবনে আফফান, ৪/২২৪

বিরুদ্ধে গিয়ে নতুন মর্ম আবিষ্কার করতে গেলে এর অর্থ দাঁড়ায়, তারা সকলেই ভুলের ওপর একমত ছিলেন।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা তাদাব্বুরের মাজালগুলো (ক্ষেত্র) চিহ্নিত করতে পারি—

১. নুসুস থেকে বিধান সংশ্লিষ্ট নয় এমন মর্ম উদঘাটন করা, যা সালাফদের ফাহমের বিরুদ্ধে যায় না।

২. আপতিত নতুন পরিস্থিতিতে ও নতুন বিষয়ে নুসুসে শরিয়াহ থেকে বিধান উদঘাটন করা।

৩. সালাফদের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ ফাহমসমূহ থেকে তাদাব্বুর ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সবচেয়ে যথার্থ মর্মকে উদঘাটন করা। তবে তাদাব্বুরের এই মাজাল বা ক্ষেত্র ইলমের শাস্ত্রীয় ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আর কারও জন্য নয়।

৪. পাঠক বা মুতাদাব্বিরের নিজস্ব অবস্থা বিবেচনায় এই অনুসন্ধান চালানো যে, অমুক আয়াতের ব্যাপারে আমি কোন অবস্থানে আছি, আমার কোথায় থাকা উচিত ছিল এবং আমি কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। সামগ্রিকভাবে সকলের জন্য এবং বিশেষভাবে সাধারণ মানুষ ও তালেবুল ইলমের জন্য এটাই তাদাব্বুরের প্রধান মাজাল বা ক্ষেত্র।

সুতরাং সালাফের ফাহম আঁকড়ে ধরা কখনোই আল্লাহর নির্দেশিত তাদাব্বুরে কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় নয়; বরং সালাফদের ফাহম ছাড়া আমাদের তাদাব্বুর সঠিক ও নিরাপদ পথে পরিচালিত হতে পারবে না। সালাফের ফাহম আমাদের তাদাব্বুরকে সুশৃঙ্খল, নিরাপদ ও অধিক শক্তিশালী করে।

পঞ্চম সংশয় : আকল ও ফাহমুস সালাফ

সালাফদের ফাহম আঁকড়ে ধরলে মানুষের আকলকে অকোজে করে রাখা হয় এবং আকলের অবমূল্যায়ন করা হয়। অথচ শরিয়াহর দলিল-আদিল্লার ক্ষেত্রে আকলই হলো মূল; বরং আকলই হলো শরিয়াহর মূল উৎস।

আবার কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী বলে থাকেন, এর চেয়ে বড় চিন্তাগত সংকট আর কী হতে পারে যে, উম্মতের আকলকে অকেজো করে মৃত মানুষদের কাছ থেকে জীবিত মানুষদের জন্য সমাধা গ্রহণ করা লাগবে?

তাদের কারও কারও মতে, বর্তমান মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় সংকট হলো—নিজেদের আকলের ওপর পূর্ববর্তী মৃতদের নকল (বর্ণিত মতামত)-কে প্রাধান্য দেওয়া।

নিরসন :

এই ধরনের আপত্তির ধারা নতুন কিছু নয়। অনেক পুরাতন। বর্তমান মডার্নিস্টরা এই আপত্তি সামনে আনলেও পূর্বে আহলুস সুন্নাহ থেকে বহির্ভূত মুতাজিলারাও এই আপত্তি তুলেছিল। তখন তাদের আপত্তির উৎস ছিল সে সময়ের গ্রিক দর্শন। আর বর্তমানে এই আপত্তির উৎস হলো পশ্চিমা দর্শন 'হিউম্যানিটি'।

ইসলাম কখনো আকলকে অবমূল্যায়ন করেনি। ইসলামি শরিয়ায় আকলের গুরুত্ব একটি স্বীকৃত বিষয়। পবিত্র কুরআনে প্রায় ৪৯ বার আকল শব্দটি কয়েকভাবে

ব্যবহৃত হয়েছে।[১৬০] আল্লাহকে চেনার জন্য, সত্যকে বোঝার জন্য এবং ইসলামকে গ্রহণ করার জন্য কুরআনের অসংখ্য জায়গায় মহান আল্লাহ তাআলা মানুষকে আকল ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَ فُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا.

'(হে রাসুল!) তাদেরকে বলো, আমি তোমাদেরকে কেবল একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি। তা এই যে, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু-দুজন অথবা এক-একজন করে দাঁড়িয়ে যাও, তারপর ইনসাফের সাথে চিন্তা করো।'[১৬১]

অন্যত্র তিনি বলেন,

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে (এবং তা লক্ষ্য করে বলে ওঠে), হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। আপনি এমন (অনর্থক) কাজ থেকে পবিত্র। সুতরাং আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।'[১৬২]

قُلِ انْظُرُوْا مَا ذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ.

'(হে নবি!) তাদেরকে বলো, একটু লক্ষ করে দেখো আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে কী কী জিনিস আছে? কিন্তু যেসব লোক ঈমান আনার নয়, (আসমান ও জমিনে বিরাজমান) নিদর্শনাবলি ও সতর্ককারী (নবি)-গণ তাদের কোনো কাজে আসে না।'[১৬৩]

---

১৬০. কিমাতুল আকল ফিল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৩

১৬১. সুরা সাবা, আয়াত ৪৬

১৬২. সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯১

১৬৩. সুরা ইউনুস, আয়াত ১০১

যারা আকল থেকে উপকৃত হয় না, পবিত্র কুরআনে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ.

'তারা বধির, মূক, অন্ধ। সুতরাং তারা কিছুই বোঝে না।'[১৬৪]

بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ.

'কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।'[১৬৫]

وَ قَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِیْۤ اَصْحٰبِ السَّعِیْرِ.

'তারা আরও বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না।'[১৬৬]

শুধু তাই নয়, আকল হলো বান্দার ওপর শরিয়াতের বিধান কার্যকর হওয়ার পূর্বশর্ত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তিন ব্যক্তি থেকে হিসাবের কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে—ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত, ছোট বাচ্চা থেকে প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) না হওয়া পর্যন্ত এবং পাগল থেকে বুঝ ও জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত।'[১৬৭]

কিন্তু মানুষের আকল স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এই আকল বিভিন্ন কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয়। নিজের অভিজ্ঞতা, আবেগ অনুভূতি, প্রবৃত্তি, চারপাশের পরিবেশসহ আরও অনেক প্রবণতা মানুষের আকলে প্রভাব ফেলে। এটা সে অনুধাবন করুক কিংবা না করুক। এজন্য দেখা যায়, কোনো কোনো বিষয়ে মানুষ একবারেই তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফেলে। কারণ তার আকল বহিরাগত বিভিন্ন প্রবণতা থেকে প্রভাবিত হয়।

ফলে আকলের এমন কিছু সূত্র দরকার, যার আলোকে আকল পরিচালিত হলে এগুলো তাকে বিভিন্ন প্রবণতা থেকে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় রেখে সঠিক দিকে

---

১৬৪. সুরা বাকারা, আয়াত ১৭১

১৬৫. সুরা আনকাবুত, আয়াত ৬৩

১৬৬. সুরা মুলক, আয়াত ১০

১৬৭. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২৪৬৯৪; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৪০০

নিয়ে যাবে। মৌলিকভাবে সে সূত্র হলো 'ওহি'। এজন্য আকল স্বয়ংসম্পূর্ণ কিছু নয়; বরং আকলের শক্তি চোখের দৃষ্টিশক্তির মতো। চোখের সাথে সূর্য ও অন্য কিছুর আলো মিলিত হলে যেমন দৃষ্টিশক্তি সঠিকভাবে কাজ করে, তেমনিভাবে আকলের সাথে যখন ঈমান ও কুরআন-সুন্নাহর আলো মিলিত হবে, তখন তা সঠিকভাবে কাজ করবে।[১৬৮]

এই বিষয়টি আমরা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে দেখতে পাব। যেমন মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

'তারা যদি তোমার ফরমায়েশ মতো কাজ না করে, তবে বুঝবে, তারা মূলত তাদের খেয়াল-খুশিরই অনুসরণ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ হতে আগত হেদায়াত ছাড়া কেবল নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে, তার চেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।'[১৬৯]

অন্যত্র বলেছেন,

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا.

'এবং (হে রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি তোমার প্রতিও সত্য সংবলিত কিতাব নাজিল করেছি, তার পূর্বের কিতাবসমূহের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং তাদের মধ্যে সে বিধান অনুসারেই বিচার করো, যা আল্লাহ নাজিল করেছেন। আর তোমার নিকট যে সত্য এসেছে, তা ছেড়ে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।'[১৭০]

---

১৬৮. মাজমুউল ফাতাওয়া, ৩/৩৩৯
১৬৯. সুরা কাসাস, আয়াত ৫০
১৭০. সুরা মায়েদা, আয়াত ৪৮

আল্লামা শাতেবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যে বিষয় প্রাধান্য পাওয়ার উপযুক্ত, তাকে প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক। সে জিনিসটা হলো শরিয়াহ। আর যে জিনিস প্রাধান্য না পাওয়ার উপযুক্ত, সেটাকে প্রাধান্য না দেওয়াই আবশ্যক। সে জিনিসটা হলো আকল। সুতরাং অপূর্ণাঙ্গ ও মুখাপেক্ষী বিষয়কে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয়ের ওপর বিচারক মানা মোটেও শুদ্ধ নয়। এটি যুক্তি ও দলিল উভয়টিরই পরিপন্থি।'[১৭১]

সুতরাং ওহির সূত্র ছাড়া মানুষ যখন আকল ব্যবহার করে, তখন মূলত সেটা আকলে সালিম থাকে না; বরং সেটি প্রবৃত্তি বা বহিরাগত কোনো প্রবণতায় প্রভাবিত আকলে ফাসেদ বা অসুস্থ বিবেক হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে মনে হতে পারে, ব্যক্তি খুবই যৌক্তিক ও জ্ঞানসম্পন্ন দলিল পেশ করছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা প্রবৃত্তি ছাড়া কিছুই না।

বোঝা গেল, যেকোনো চিন্তা ও বিবেচনার ক্ষেত্রে মানুষের আকল স্বয়ংসম্পূর্ণ না। মানুষের আকল বহিরাগত নানান প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। ওহির বুঝের ক্ষেত্রেও সে এসব প্রবণতা থেকে মুক্ত নয়। তাই নুসুসে শরিয়াহ বোঝার ক্ষেত্রেও মানুষের আকলকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। তা ছাড়া নুসুসে শরিয়াহর ক্ষেত্রে অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছা। আর যেহেতু মানুষের আকল নানান প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত হয়, ফলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের মর্মে পৌঁছতে সে বাধাগ্রস্ত হতে পারে। তার আকল তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পরিবর্তে প্রবৃত্তি কিংবা তার অজান্তেই ভিন্ন কোনো স্বার্থের দিকে প্রবাহিত করতে পারে। তাই নুসুসে শরিয়াহর মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বুঝ পর্যন্ত পৌঁছতে আকলকে ব্যবহারের জন্য তার সামনে অবশ্যই কেন্দ্রীয় ও মানদণ্ডের মর্যাদা রাখে এমন ফাহমসমূহ বিদ্যমান থাকা জরুরি। আরও জরুরি যথার্থ কিছু মূলনীতির। সালাফদের ফাহম ও মানহাজ হলো সেই মানদণ্ড ও কেন্দ্র। সালাফদের ফাহম কখনোই আমাদের আকলকে জুমুদের (অচলাবস্থার) দিকে ঠেলে দেয় না, আকলকে অকেজো করে রাখে না; বরং তা আমাদের আকলের আলো সরবরাহ করে এবং বিভিন্ন প্রবণতা থেকে বাঁচিয়ে একে সঠিক পথে প্রবাহিত করে।

আবার বহিরাগত বিভিন্ন আঘাতে চোখের দৃষ্টিশক্তি যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তেমনিভাবে আকলও বহিরাগত প্রভাবে ক্ষয় হতে পারে, হতে পারে অসুস্থ। এই

---

১৭১. আল ইতিসাম, ৩/২২৮

এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলেও আমাদের সালাফদের আকল বর্তমানের লোকদের চেয়ে শক্তিশালী, সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন ছিল। তারা ছিলেন রাসুলের মুখে স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ জমানার। সমাজে বিভিন্ন অপরাধের উপস্থিতি থাকলেও ইসলামি শরিয়াহ ছিল সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। আর বর্তমানে ইসলাম কোথাও প্রতিষ্ঠিত নেই। বহিরাগত বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতি মুসলিমদের ওপর রাজ করছে। কুফর, শিরক, পাপাচারের এত জয়জয়কার সালাফদের সময় ছিল কল্পনাতীত বিষয়।

সুতরাং সালাফদের ফাহম ও মানহাজের ওপর নির্ভরশীলতা মানে আকলকে অকেজো করে রাখা নয়; বরং মানুষের আকলকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখতেই নুসুসে শরিয়াহ ও সালাফদের ফাহমকে সূত্র মানা হয় এবং এর মাধ্যমে আকলকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়, যে মূল্যায়নের সে উপযুক্ত। আকলকে অবাধ ছেড়ে দেওয়া কিংবা অকেজো করে রাখা উভয়টিই আকলকে অবমূল্যায়ন করার শামিল।

ষষ্ঠ সংশয় : সৃজনশীলতা ও ফাহমুস সালাফ

ফাহমুস সালাফকে আঁকড়ে ধরার অর্থ জীবিতদের ব্যাপারে মৃতকে জিজ্ঞেস করা এবং সৃজনশীলতাকে বর্জন করে (অতীতের) চর্বিতচর্চা করা।

নিরসন :

মডার্ন সংস্কারপন্থিদের মুখে এ ধরনের অনেক বক্তব্যই শোনা যায়। যেসব বক্তব্যের মাধ্যমে তারা মূলত ফাহমুস সালাফের মর্যাদাকে খাটো করে এবং ফাহমুস সালাফকে বর্তমান মুসলিম উম্মাহর উন্নতি ও উত্থানের পথে অন্যতম বাধা হিসেবে উপস্থাপন করে।

যদি কোনো মুসলিম সততা ও বস্তুনিষ্ঠতার সাথে লক্ষ করে, তাহলে সে ফাহমুস সালাফকে আঁকড়ে ধরাই বিশুদ্ধ ও প্রশংসনীয় মনে করবে।

প্রথমত, সালাফরা হলেন এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ও সৎ অংশ। তাদের নিয়ে আমরা গর্ব করি এবং তাদের আমরা সম্মান করি। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রশংসা করেছেন এবং উম্মতের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্বের সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তাদের পথের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের ফাহম ও মানহাজের প্রতি আমাদের আস্থাশীলতা আলস্য কিংবা গোত্রপ্রীতি থেকে তৈরি নয়; বরং এর পেছনে শরয়ি ও ইলমি কারণ আছে। যেগুলোর যৌক্তিকতা সুস্থ মস্তিষ্কের কোনো ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত, সালাফরা হলেন সেই প্রজন্ম, যারা শরিয়াহকে তাদের জীবনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাস্তবায়ন করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে তারা আমাদের জন্য জীবন্ত অতীত। পক্ষান্তরে দীনের বিচারে বর্তমান উম্মাহ হলো মৃত জাতি। সুতরাং দীনের ক্ষেত্রে তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করা প্রকৃতপক্ষে আলোর কাছে আঁধারের, জীবন্তের কাছে ঘুমন্তের প্রত্যাবর্তন।

এজন্যই ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এই উম্মতের শেষ অংশের সংস্কার সে পথেই হবে, যে পথে তার প্রথম অংশ সংশোধিত হয়েছে।'[১৭২]

ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর বক্তব্যের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, সালাফ বা পূর্বসূরিদের যাতায়াত-ব্যবস্থা, বাসস্থানের কাঠামো, উৎপাদন শিল্প, চিকিৎসা, শিক্ষা, সেনাবাহিনীর কাঠামো ইত্যাদিতে ফিরে যেতে হবে; বরং সালাফদের দিকে ফিরে যাওয়ার অর্থ হলো, দীন বোঝা ও মানার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

এর থেকে স্পষ্ট হয়, সালাফদের অতীতে প্রত্যাবর্তন এবং উন্নতি-অগ্রসরতার মাঝে কোনো বিরোধ নেই; বরং সামগ্রিকভাবে প্রকৃত উন্নতি তখনই সাধন হবে, যখন মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর শরিয়াহকে আঁকড়ে ধরবে। শরিয়াহ ছাড়া তারা যেখানেই পৌঁছাবে, কখনোই তাদের সামগ্রিক ও প্রকৃত উন্নতি অর্জন হবে না। আল্লাহর শরিয়াহ ও মানবসভ্যতার উন্নতি—এ দুটির মাঝে আবশ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান।

উন্নতি ও অগ্রসরতার ক্ষেত্রে আমরা যদি পশ্চিমা বস্তুবাদী মানদণ্ডকে চূড়ান্ত আইডল হিসেবে ধরে নিই, তাহলে ইসলামের উন্নতির সূচককে আমরা অনুধাবন করতে পারব না। ইসলামে অগ্রসরতা ও উন্নতির ধারণা অনেক ব্যাপক। এখানে কেবল অর্থনীতি আর রাস্তাঘাট দিয়ে অগ্রসরতাকে পরিমাপ করা হয় না। শরয়ি আইন বাস্তবায়ন, ইনসাফ, নৈতিকতাসহ দুনিয়া ও আখিরাতমুখী এক প্রশস্ত সূচকের জায়গা থেকে ইসলাম অগ্রসরতাকে বিবেচনা করে।

সমস্যা হলো, বর্তমানে মুসলিমদের সন্তানরা মানসিকভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও মতাদর্শের কাছে পরাজয় বরণ করে নিয়েছে। তা ছাড়া নিজেদের দেশে ইসলামি শরিয়াহ বাস্তবায়িত না থাকার কারণে শরিয়াতের ছায়াতলে জীবনযাপনের স্বাদ

---

১৭২. আশ শিফা, ২/৭১

ও প্রশান্তিও তারা অনুভব করতে পারছে না। তাদের চোখের সামনে উন্নতির যে দৃষ্টান্ত জলজ্যান্ত আছে, সেটা হলো পশ্চিমা সভ্যতা। ফলে পশ্চিমা মানদণ্ডই তাদের কাছে পরম ও চূড়ান্ত আইডল হিসেবে আস্থা জুগিয়ে নিয়েছে।

পশ্চিমের প্রতি এই বিশ্বাসের জায়গা থেকে যখন তারা 'মুসলিম' নামটি আঁকড়ে ধরে বস্তুবাদী উন্নতি অর্জনের পেছনে ছোটে, তখন সালাফদের বুঝ ও আমল তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আর তখনই শুরু হয় সালাফদের পাশ কেটে যাওয়ার জন্য নানা আপত্তি ও পথ তৈরির প্রচেষ্টা। এজন্য আমরা ফাহমুস সালাফের ওপর উত্থাপিত প্রতিটি আপত্তির গভীরেই বস্তুবাদী প্রভাব দেখতে পাব। এসব আপত্তি আদতে ইলমি ও একাডেমিক জায়গা থেকে তৈরি হয়নি; বরং এগুলোর উৎস হলো পাশ্চাত্যের কাছে আদর্শিক পরাজয়।

পূর্বসূরিদের চর্চা করার মধ্যে আরেকটি দিক হলো, তাদের ইতিবাচক দিকগুলো রপ্ত করা ও বাস্তবায়ন করা। নেতিবাচক বিষয়গুলো জানা ও পরিহার করা। তাই সালাফদের ফাহম কখনো দুনিয়াবি নিত্যনতুন সরঞ্জামের পথে অন্তরায় নয়; বরং এর আলোকেই আমরা জানতে পারব, এই চাকচিক্যময় পৃথিবীতে কোনটি পাপপূর্ণ ভোগ-বিলাসী সরঞ্জাম আর কোনটি তা নয়!

সুতরাং পূর্বসূরি সালাফদের সোনালি অতীতকে মনেপ্রাণে লালন করা মানেই অতীতকে আঁকড়ে ধরে অগ্রসরতার পথ রুদ্ধ করা নয়; বরং সালাফ তথা স্বর্ণযুগের সফল মানুষের বিশুদ্ধ ঐকমত্যপূর্ণ ফাহমের অনুসরণ তো কেবল কুরআন-সুন্নাহ কেন্দ্রিক জীবন পরিচালনার রাহনুমায়ির জন্য।

নিজের মূলকে পরিবর্তন করার নাম সৃজনশীলতা নয়। এটাকে সৃজনশীলতার পরিবর্তে আত্মবিস্মৃতি বলাই সবচেয়ে যৌক্তিক। প্রকৃত সৃজনশীলতা হলো, নিজের অতীত ও বিশুদ্ধ মূলকে বর্তমানে কার্যকর করা এবং সেটাকে অপরিবর্তনীয় ও অবিকৃতভাবে বর্তমানের সামনে তুলে ধরা ভবিষ্যৎ নিমার্ণের জন্য। আমাদের মনে রাখতে হবে, সত্য ও বিশুদ্ধের বিপরীতে অসত্য ও অশুদ্ধ কখনো সৃজনশীলতাকে ধারণ করে না। সৃজনশীলতা সমাদৃত ও উপকারকারী হওয়ার জন্য সত্য ও শুদ্ধতাকে ধারণ করা অপরিহার্য বিষয়। সুতরাং সালাফদের সত্য, বিশুদ্ধ ফাহম ও মানহাজকে পাশ কাটিয়ে কোনো সৃজনশীলতার চর্চা হতে পারেন না। যেটা হবে সেটা হলো, সত্যকে মিথ্যা দিয়ে এবং বিশুদ্ধকে অশুদ্ধ দিয়ে প্রলেপ দেওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

সপ্তম সংশয় : ঐতিহ্য (তুরাস) ও ফাহমুস সালাফ

ফাহমুস সালাফ ইসলামি তুরাসের অন্তর্ভুক্ত। আর ভুল-শুদ্ধ, হক-বাতিল মিলিয়েই তুরাস (ঐতিহ্য) হয়ে থাকে। সুতরাং ফাহমুস সালাফও হক বাতিলের সংশয় থেকে মুক্ত নয়। তাই ফাহমুস সালাফকে অনুসরণের দৃষ্টিতে না দেখে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। সমালোচনার ঊর্ধ্বে কেবল কুরআন ও সুন্নাহ।

নিরসন :

এক. 'তুরাস হক-বাতিল ভুল-শুদ্ধের সম্ভাবনা রাখে' এই দাবিতে কোনো ভুল নেই। তুরাস একটি ব্যাপক শব্দ। যার অর্থ হলো, পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া ইলম, মতামত, ইজতিহাদ, তাদাব্বুর, গবেষণাপদ্ধতি এই সবকিছু। আর এখানে ভুল-শুদ্ধ উভয়টারই অস্তিত্ব আছে। ফলে পরবর্তীদের জন্য দায়িত্ব হলো, এই ভুল-শুদ্ধকে পৃথক করা।

কিন্তু আরও জরুরি হলো ভুল-শুদ্ধ পার্থক্য করার জন্য যথাযথ মানদণ্ড, প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রস্থল ও সঠিক মানহাজের দ্বারস্থ হওয়া। প্রবৃত্তি কিংবা মানসিক ও বহিরাগত আদর্শিক চাপের ভিত্তিতে এই পৃথকীকরণ ইসলাম সমর্থিত নয়। অথচ বর্তমানে ফাহমুস সালাফের ওপর আপত্তিকারীরা দ্বিতীয় অবস্থার ভিত্তিতেই ভুল-শুদ্ধ নির্ণয় করছে।

দুই. এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কুরআন ও সুন্নাহই একমাত্র ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে এবং হক-বাতিলের প্রধান মানদণ্ড। মতভেদ ও মতবিরোধের সময় মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের কুরআন ও সুন্নাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖۗ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ.

'তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো তার মীমাংসা আল্লাহরই ওপর ন্যস্ত; তিনিই আল্লাহ, যিনি আমার প্রতিপালক। আমি তাঁরই ওপর ভরসা করেছি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী হয়েছি।'[১৭৩]

ফাহমুস সালাফ এই দুই কেন্দ্রস্থলের সাথেই সংশ্লিষ্ট। কুরআন ও সুন্নাহ নিছক কিছু পুঁথিগত শব্দ নয়; বরং এগুলোর অর্থ ও মর্ম আছে। আছে আমলের রূপরেখা। আর সালাফদের ফাহম ও আমল হলো কুরআন-সুন্নাহ অনুধাবন ও বাস্তবায়ন করার কেন্দ্রস্থল।

এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা হলো, উম্মতের মাঝে বিভিন্ন ফিরকার আবির্ভাব ও মানহাজগত দ্বন্দ্বের সময় যে কষ্টিপাথর দিয়ে হক-বাতিল নির্ণয় হবে, সেটা হলো কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফদের আমল ও বুঝ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বনি ইসরাইল ৭২টি দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে। একটা দল ছাড়া তারা সকলেই জাহান্নামে যাবে।' সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! সেটি কোন দল? তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যে দল আমার ও আমার সাহাবিদের পথের ওপর থাকবে।'[১৭৪]

এখানে কুরআন ও হাদিসের সাথে সাহাবিদের পথ ও পন্থার কথাও বলা হয়েছে। আর এটিই 'ফাহমুস সালাফ'। এটিই হলো মুমিনদের মানহাজ, যার অনুসরণের

---

১৭৩. সুরা শুরা, আয়াত ১০

১৭৪. জামে তিরমিজি, হাদিস নং ২৬৪১, হাদিসটির সনদ হাসান। ইমাম তিরমিজি রহিমাহুল্লাহ এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে বলেন,

هذا حديث مفسَّر حسن غريب لا نعرف مثل هذا إلاّ من هذا الوجه.

নির্দেশ মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَ مَنۡ یُّشَاقِقِ الرَّسُوۡلَ مِنۡ بَعۡدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الۡهُدٰی وَ یَتَّبِعۡ غَیۡرَ سَبِیۡلِ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰی وَ نُصۡلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَ سَآءَتۡ مَصِیۡرًا.

‘আর যে ব্যক্তি তার সামনে হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করবে ও মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ অনুসরণ করবে, আমি তাকে সে পথেই ছেড়ে দেব, যে পথ সে অবলম্বন করেছে। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।’[১৭৫]

তিন. ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, ফাহমুস সালাফ ইসলামি তুরাসের অন্তর্ভুক্ত এবং তা হক। শরয়ি নুসুসের ক্ষেত্রে তাদের বুঝ ও আমলই উত্তম আদর্শ। তুরাস হক ও বাতিল উভয়টাই হওয়ার সম্ভাবন রাখে। ইসলামি তুরাস থেকে হক-বাতিল নির্ণয়ের জন্যও একটি মানদণ্ড থাকা আবশ্যক। সালাফদের ফাহম ও মানহাজই হলো আমাদের জন্য সেই মানদণ্ড, যার মাধ্যমে আমরা ইসলামি তুরাস থেকে আহলুস সুন্নাহর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাতিল ফিরকাসমূহের মতামতকে পৃথক করব।

৭৫. সুরা নিসা, আয়াত ১১৫

অষ্টম সংশয় : যুগের পরিবর্তন ও ফাহমুস সালাফ

সালাফদের বুঝ তাদের যুগের সাথে সংগতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। যুগের পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে টেক্সটের (মূল নসের) বুঝেরও পরিবর্তন হওয়া জরুরি। কারণ কুরআন-সুন্নাহ প্রত্যেক যুগ ও স্থানের জন্য উপযোগী। সালাফদের বুঝকে আঁকড়ে ধরা নুসুসে শরিয়াহর এই গতিশীলতাকে নষ্ট করে দেয়।

নিরসন :

বর্তমান সময়ে এসে আমরা আধুনিক শিক্ষিত কিংবা পশ্চিমা সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত স্কলারদের মুখেও এ ধরনের বক্তব্য শুনতে পাই। এমনকি আন্তর্জাতিকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করা কিছু কিছু 'দুকতুর' এ বক্তব্যের মাধ্যমে নিজেদের ইজতিহাদি ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলাপ জাহির করে থাকেন। বরাবরের মতো কোনো ব্যক্তির নাম ও বক্তব্যকে উল্লেখ করা ছাড়াই আমরা মূল আপত্তির বিষয়টি নিরসন করার চেষ্টা করব।

এক. এই বক্তব্যের মাধ্যমে শরয়ি নসসমূহের পবিত্রতা নষ্ট করে তা আপেক্ষিক বানিয়ে দেওয়া হয়। তখন প্রত্যেকের সামনে নিজের মনমতো কুরআন-সুন্নাহ ব্যাখ্যা করার পথ খুলে যায়। নুসুস বোঝার ক্ষেত্রে তখন একমাত্র কেন্দ্র হয়ে যায়

মানুষের আকল ও কথিত বাস্তবতা, যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল এবং ত্রুটিযুক্ত। ফলে এই দাবি মেনে নিলে শরিয়াতের বিধানসূমহ তার শ্বাশত মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। নস বোঝার মৌলিক কোনো কেন্দ্র তখন অবশিষ্ট থাকে না।

এই চিন্তার পেছনে টেক্সট পাঠ-সংক্রান্ত একটি বিশেষ পশ্চিমা নীতি প্রভাব রেখেছে। সেই বিশেষ পদ্ধতিটির নাম হলো—'তারিখিয়্যাহ বা ইতিহাসবাদ'। তারিখিয়্যাহর মূল কথা হলো, ওহির টেক্সট ও তার বুঝকে কেবলই একটি ঐতিহাসিক আবিষ্কার হিসেবে দেখা। ইতিহাসের নির্দিষ্ট সময় এই টেক্সটগুলো এসেছে এবং একে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বুঝ তৈরি হয়েছে। ফলে এই বুঝগুলো নির্দিষ্ট ওই জমানার সাথেই বিশেষিত হয়ে থাকবে। ইতিহাস ও যুগের অগ্রসরের সাথে সাথে টেক্সটের এই বুঝগুলো নতুন নতুন রূপ ধারণ করবে। মানুষের জীবনযাত্রার অগ্রসরের সাথে সাথে প্রত্যেক জমানার লোক নিজেদের মতো করে নতুন নতুন বুঝ তৈরি করে নেবে। অর্থাৎ বক্তার উদ্দেশ্য কী, এই বিষয়ের চেয়ে এখানে যুগের পরিবর্তন বা বাস্তবতা বেশি গুরুত্ব পাবে।

আধুনিকপন্থি মুসলিমরা ইতিহাসবাদের মাধ্যমে চরমভাবে প্রভাবিত। এজন্য তারা মনে করে, 'সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফদের ফাহম তাদের যুগের বাস্তবতা ও সংস্কৃতি অনুযায়ী তৈরি হয়েছিল। সেগুলো আমাদের বাস্তবতা ও সংস্কৃতির জন্য উপযোগী নয়। এজন্য আমাদেরকে বর্তমান সময়ের সাথে মিলিয়ে নুসুসে শরিয়াহ পাঠ করতে হবে। এই পাঠের ক্ষেত্রে আমাদের বাস্তবতার আলোকে নুসুসে শরিয়াহ বুঝতে হবে। নুসুসে শরিয়াহর কারও বুঝই অকাট্য না, সব বুঝই আপেক্ষিক, অকাট্য কিছু নয়।'

এ ধরনের দাবি সম্পূর্ণ ভুল। নুসুসে শরিয়াহ বোঝার ক্ষেত্রে সালাফে সালেহিনের মূল মনোযোগ কেবল তাদের যুগের সংস্কৃতির প্রতি ছিল না। আর না তাদের ফাহম নির্দিষ্ট বাস্তবতা ও সামাজিকতা নির্ভর ছিল। সাহাবায়ে কেরাম নুসুসে শরিয়াহকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ও বুঝ, আরবি ভাষা, নুসুস অবতরণের প্রেক্ষাপট ইত্যাদি নুসুস সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে বুঝেছেন। এই বুঝ কিয়ামত পর্যন্ত আগত সময় ও বাস্তবতার সমাধান দিতে সক্ষম। তাই এর মাধ্যমে তারা উম্মতকে আপেক্ষিক নয়, বরং সার্বজনীন এক ফাহমের সিলসিলা উপহার দিয়েছেন। এরপর তাবেয়ি, তাবে-তাবেয়ি ও আইম্মায়ে কেরামের সেই ফাহমের

ওপর ভিত্তি করে ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রের একটি বিশাল কাঠামো গঠিত হয়েছে, যেটি আমরা তাদের কিতাবাদিতে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই। সুতরাং সালাফরা নির্দিষ্ট যুগ ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কুরআন-সুন্নাহকে বুঝেছেন এমন দাবি সম্পূর্ণ বাতিল। এই ধারণার কোনো ঐতিহাসিক বাস্তবতাও আমরা সালাফদের ইলমি কারনামায় পাব না। সালাফে সালেহিনের বুঝকে সাধারণভাবে আপেক্ষিক বানিয়ে দিয়ে, প্রত্যেকের বুঝের কাছে নুসুসে শরিয়াহ ছেড়ে দিলে দীনের কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। শরিয়াত তখন ওহির মর্যাদা হারিয়ে মানুষের অবাধ্য ও বিভ্রান্ত আকলের কাছে খেলনার পাত্রে পরিণত হবে। তখন আকলের ওপর ওহির কর্তৃত্ব থাকবে না; বরং ওহির ওপর প্রবৃত্তি প্রভাবিত মানবীয় আকল রাজ করবে, যা নির্ভুল জ্ঞানতত্ত্বকে ধ্বংস করে দেয়। কারণ মানব আকলের ওপর ওহির কর্তৃত্ব ছাড়া কোনো যথার্থ ও বিশুদ্ধ জ্ঞানতত্ত্ব অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না।

এই দাবির আবশ্যিক ফল হলো, শরিয়াতের বিধানসমূহকে নির্দিষ্ট একটি জমানার জন্য বিশেষায়িত করে দেওয়া এবং শরয়ি নুসুসকে যুগের অনুগামী বানিয়ে নতুন ব্যাখ্যার আবিষ্কার করা। এভাবে কখনো শরিয়াতের অনুসরণ হয় না, তখন নিজের আকল কিংবা প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হয়। ইসলামের দাবি এটা নয় যে, যুগের আলোকে কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা পরিবর্তন করা হবে; বরং শরিয়াতের আলোকে যুগ পরিবর্তন করাই নবি-রাসুলদের কাজ ছিল।

ওহি প্রেরণ করে তার অনুসরণ ও তা আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেওয়া এবং বিমুখ হলে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন, আবার একই সাথে সকল ধরনের মানুষের জন্য ইচ্ছামতো ওহির মর্ম বের করার উন্মুক্ত অনুমোদন দেওয়া পদ্ধতিগতভাবে একটি সাংঘর্ষিক বিষয়। মহান আল্লাহ তাআলা এ ধরনের সাংঘর্ষিক নির্দেশনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

দুই. কুরআন ও সুন্নাহ কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি যুগ এবং প্রতিটি স্থানের জন্য উপযুক্ত। এই কথার অর্থ এটা নয় যে, যুগের সাথে সাথে কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যায় পরিবর্তন আসবে এবং যুগের যেকোনো পরিবর্তনকে ইসলাম গ্রহণ করে নেবে। ইসলাম মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ এক জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের এমন কোনো অনুষঙ্গ নেই, যার ব্যাপারে ইসলামের বিধান নেই। ইসলামের এমন কিছু প্রিন্সিপাল (মূলনীতি) আছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত যত পরিবেশ ও পরিস্থিতি আসবে, সবগুলোর ওপর তার বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।

এটিই হচ্ছে ইসলামের গতিশীলতা। একজন মুজতাহিদ ফকিহের দায়িত্ব হলো, তিনি নবউদ্ভাবিত পরিস্থিতিতে শরিয়াতের বক্তব্য কী, তা গবেষণা করে বের করবেন। তার গবেষণার উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহর বিধান পর্যন্ত পৌঁছা, নিজের প্রবৃত্তি কিংবা যুগের কাছে শরিয়াহকে বলি দেওয়া নয়।

যুগের প্রয়োজনই মানবজীবনের চূড়ান্ত প্রয়োজন নয়। অনেক সময় কৃত্তিম প্রয়োজনও তৈরি হয়। কাফের বা শত্রু পক্ষ থেকে কোনো অবস্থা চাপিয়ে দেওয়া, অথবা দীনের প্রভাব কমে যাওয়ার কারণে শরিয়াহর কিছু বিধান আমাদের জন্য কষ্টকর বা অসম্ভবপর মনে হতে পারে। এই অবস্থার জন্য আমাদের শরিয়াতের বিধান পরিবর্তন বা সংস্কার করে ফেলা কাম্য নয়; বরং যে অবস্থায় আমরা পতিত আছি, সে অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টাই এখানে ইসলাম আমাদের থেকে কামনা করে। হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি রহিমাহুল্লাহ শরিয়াহর বিধান পরিবর্তনের ব্যাপারে মডার্নিস্টদের জবাব দিতে গিয়ে বলেন, 'শরিয়াহর কোনো বিধান পালন করতে গিয়ে আমরা যদি কষ্টের সম্মুখীন হই তার মানে এই নয় যে, সমস্ত মানুষ এটি পালন করছে, তারপর কষ্টে পতিত হচ্ছে। এই বিষয়টি কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। এই কাঠিন্যের বাস্তব কারণ হলো, শরিয়াহর বিধান পালনকারীর সংখ্যা পালন না করা ব্যক্তিদের তুলনায় খুবই নগণ্য। যখন অল্প সংখ্যক মানুষ শরিয়াহর বিধান পালন করতে চাচ্ছে, তখনই অধিকাংশরা তার বিরোধিতা করছে কিংবা তার সঙ্গ দিচ্ছে না। তখন সাধারণতই সংকীর্ণতা ও জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং এখানে কঠোরতা এই কারণে সৃষ্টি হয়নি যে, স্বয়ং এই বিধানগুলোই জটিল; বরং এর জন্য দায়ী হলো, আমরা যে জীবনব্যবস্থায় বসবাস করছি, সেখানে অধিকাংশ অধিবাসী এই বিধানগুলোর বিরোধিতা করছে।'[১৭৬]

তিন. এই সংশয়ের আরেকটি মৌলিক ভিত্তি হলো, 'যুগের পরিবর্তনে ফতোয়ার পরিবর্তন' ফিকহের এই মূলনীতিটি। ফুকাহায়ে কেরামের বিভিন্ন ইবারত থেকে বোঝা যায় যে, জমানার পরিবর্তনে বিধানের পরিবর্তন হয়। তবে এই বক্তব্যটি সামগ্রিক কোনো উসুল বা মূলনীতি নয় যে, শরিয়াতের সকল বিধানই যুগের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তন হয়ে যাবে। যেমনটা বর্তমানের অনেক মুলহিদ ও মুক্তচিন্তার দাবীদাররা মনে করে থাকে। অথচ উল্লিখিত বক্তব্যের দ্বারা ফুকাহায়ে কেরামের উদ্দেশ্য হলো এমন সব বিধানাবলি, যেগুলো কুরআন-হাদিসে

১৭৬. আল ইন্তিবাহাতুল মুফিদাহ, পৃষ্ঠা ১১৫

সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা নেই এবং যে বিধানগুলো নির্দিষ্ট কোনো কারণ বা প্রচলনের ওপর নির্ভরশীল ছিল।[১৭৭]

শরিয়াতের মৌলিক আহকামে যুগ ও অবস্থার পরিবর্তনে কোনো পরিবর্তন আসে না; পরিবর্তন আসে ফতোয়ায়। ফতোয়া হলো নির্দিষ্ট অবস্থার ওপর শরয়ি কোনো আহকামের প্রায়োগিক নির্দেশ। ফতোয়া আর শরয়ি বিধানের ভেতর পার্থক্য আছে। যেমন, 'সুদ হারাম' এটি হলো শরয়ি বিধান। আর নির্দিষ্ট কোনো লেনদেনকে সুদি লেনদেন হিসেবে চিহ্নিত করা, কিংবা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে সুদের সাথে যুক্ত বলে মতামত দেওয়া হলো ফতোয়া। 'সুদ হারাম' এই হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো লেনদেন বা ব্যক্তি সারা জীবন সুদের ওপর অবিচল নাও থাকতে পারে। লেনদেনের অবস্থার পরিবর্তন কিংবা ব্যক্তির অবস্থান পরিবর্তন হতেই পারে। সেই পরিবর্তনের ফলে যদি উক্ত লেনদেন বা ব্যক্তি সুদের সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে আসে, তাহলে তাদের ব্যাপারে ফতোয়াতেও পরিবর্তন আসবে। তখন আর সেই লেনদেন সুদি অথবা সেই ব্যক্তি সুদের সাথে জড়িত হিসেবে ফতোয়া আসবে না।

সুতরাং শরিয়াতের বিধানে কোনো পরিবর্তন নেই। পরিবর্তন আসে ফতোয়ার ক্ষেত্রে। কারণ ফতোয়া প্রদান করা হয় নির্দিষ্ট অবস্থার পরিপেক্ষিতে। আবার অনেক সময় শরিয়াহর বিধান প্রয়োগ করা হয় নির্দিষ্ট প্রথা ও প্রচলনের ভিত্তিতে। এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অবস্থা বা প্রচলনের পরিবর্তন হলে বিধানের প্রয়োগেও পরিবর্তন আসে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি ভালো করে বুঝে আসবে—যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তির করায়ত্তে (দখলে) নেই এমন জিনিস বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।[১৭৮] এই হাদিস থেকে বিধান প্রমাণিত হয় যে, করায়ত্তে আসা ছাড়া কোনো পণ্য বিক্রি বৈধ নয়। এই বিধানে কোনো পরিবর্তন আসবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এই বিধান বহাল থাকবে। কিন্তু কোনো জিনিস কারও কাছে কীভাবে আসলে সেটা তার কবজায় বা দখলে এসেছে বলা হবে? এ বিষয়টির মাঝে যুগ ও সমাজের ভিন্নতায় পরিবর্তন এসেছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রচলন চালু হয়েছিল। তাই মাসআলার প্রায়োগিক রূপ এবং ফাতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে ভিন্নতা ও পরিবর্তন এসেছে।

---

১৭৭. আত তাসলিম লিন নাসসিশ শরইয়্যি, পৃষ্ঠা ১৪১
১৭৮. মুজামুল আওসাত লিত তাবারানি, ৯০০৭

মহান আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করো।'[১৭৯] এখন স্ত্রীদের সাথে সদাচারের নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। কিন্তু সদাচারের মর্ম স্থান কাল পাত্রভেদে ভিন্ন হওয়ার ফলে নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে সদাচার পালন বা লঙ্ঘন-সংক্রান্ত বিধান প্রয়োগে পরিবর্তন আসবে। যেমন কোনো এলাকায় বা পরিবারে তুই করে সম্বোধন সদাচারের পরিপন্থি হতে পারে; আবার কোনো এলাকায় বা পরিবারে এই সম্বোধন স্বাভাবিকও হতে পারে। তাই দুই অবস্থায় স্বামীর ওপর বিধানে ভিন্নতা আসবে।[১৮০]

চার. আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, যুগের পরিক্রমায় মানবজাতি যেসব পরিস্থিতি ও অভ্যাস অতিক্রম করেছে, সেগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া একটি স্বীকৃত বিষয়। এসব পরিস্থিতি ও অভ্যাস অসীম নয়; বরং সাদৃশ্যের দিক থেকে সীমাবদ্ধ বলা যায়। কারণ বুদ্ধি, আত্মা ও শরীর ইত্যাদির দিক থেকে পুরো মানবপ্রকৃতি সাদৃশ্যপূর্ণ। একমাত্র কৃত্রিমতা এসে এই জায়গায় বৈসাদৃশ্য তৈরি করতে পারে।

সুতরাং নব্য ও উদ্ভব কোনো পরিস্থিতির ওপর বিধান প্রয়োগের জন্য শরয়ি নুসুসের এমন কোনো বুঝ আবিষ্কারের প্রয়োজন নেই, যা সালাফদের বুঝ থেকে ভিন্ন হবে। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সালাফদের বুঝ ভালোভাবে অনুধাবন করে, উদ্ভব পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণ করে তার ওপর সালাফদের বুঝ অনুপাতে শরয়ি বিধান প্রয়োগ করা। যা প্রত্যেক যুগের ফকিহদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

১৭৯. সুরা নিসা, আয়াত ১৯

১৮০. তবে উরফ তথা প্রথা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত আছে। যেমন : সমাজে প্রথাটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকা, প্রথাটি কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার বিপরীত না হওয়া, এর বিরুদ্ধে অন্য কোনো প্রথা প্রচলিত না থাকা ইত্যাদি।

নবম সংশয় : ফেমিনিজম ও ফাহমুস সালাফ

'সালাফে সালেহিন কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে নিজেদের পুরুষ সত্তার পক্ষাবলম্বন করতে গিয়ে শরয়ি টেক্সটের পুরুষতান্ত্রিক তাফসির ও ব্যাখ্যা আবিষ্কার করেছে। তাদের ব্যাখ্যা নারীদের স্বার্থবিরোধী। তাই আমাদেরকে নতুন করে ইসলামি টেক্সটের নারীবাদী ব্যাখ্যা সংকলন করতে হবে (নাউজুবিল্লাহ)।'

নিরসন :

বর্তমান সময়ে মুসলিম-সমাজ ও নারীদেরকে প্রভাবিত করছে এমন একটি পশ্চিমা মতবাদ হলো—'ফেমিনিজম বা নারীবাদ'। নারীবাদের একটি মৌলিক সমস্যা হলো, তা নারী-পুরুষের মাঝে যেকোনো প্রকার পার্থক্যকে নাকচ করে দেয়। চাই সেই পার্থক্য ন্যাচারাল (প্রাকৃতিক) কিংবা ন্যায়সঙ্গতই হোক না কেন। কিন্তু ইসলামি শরিয়াতে নারী-পুরুষের মাঝে শারীরিক, মানসিক ও দায়িত্ব-কর্তব্যের দিকে থেকে ইনসাফভিত্তিক পার্থক্য একটি স্বীকৃত বিষয়। পশ্চিমা ফেমিনিজম দ্বারা প্রভাবিত এক শ্রেণির মুসলিম নামধারী ফেমিনিস্ট নারীর আবির্ভাব ঘটেছে মুসলিম বিশ্বে। তারা ফেমিনিজমকে ইসলামাইজেশন করতে গিয়ে সবচেয়ে বড় যে বাধার সম্মুখীন হয়েছে সেটা হলো—'সালাফদের ফাহম ও ফিকহ'। এই বাধাকে অপসারণের জন্য এরা অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে সালাফদের ফিকহ ও ফাহমকে পুরুষতান্ত্রিক বলে ট্যাগ দেওয়া শুরু করে দেয়। উল্লিখিত বক্তব্যটি তারই বহিঃপ্রকাশ।

এই বক্তব্যের মাধ্যমে একই সাথে ইসলামি ফেমিনিস্টদের (মানে ইসলামের লেভেলধারী, ফেমিনিজম কখনো ইসলামি হতে পারে না) ভয়ংকর মানসিকতা ফুটে ওঠে। তারা নিজেদের নারীবাদী চিন্তার জন্য ইসলামি শরিয়াহর যেকোনো কিছু প্রত্যাখ্যান ও বিকৃতি করতেও প্রস্তুত। এজন্য দেখা যায়, তাদের নারীবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে গেলে সহিহ হাদিসকে পর্যন্ত তারা অস্বীকার করে বসে। পাশাপাশি এটাও ফুটে ওঠে যে, ইসলামি শরিয়াহর কাঠামো, ফিকহ ও তাফসিরের মূলনীতি, সিলসিলা, উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া এবং সালাফে সালেহিনের জীবনী সম্পর্কে তারা কতটা অজ্ঞ! কারণ এগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত কোনো ব্যক্তি (সালাফে সালেহিনের রেখে যাওয়া) ইসলামি তুরাসের ওপর কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব ও প্রভাবিত হওয়ার অভিযোগ তুলতে পারে না।

সালাফে সালেহিনের সামগ্রিক বুঝ ও ফিকহ আল্লাহপ্রদত্ত মানদণ্ড ও বস্তুনিষ্ঠতার জায়গায় পরিপূর্ণ উত্তীর্ণ। ইসলামি শরিয়াহর মুতাওয়ারিস ফাহম ও ইলমের ক্রমবিকাশ, পূর্ববর্তী সালাফদের সাথে এর সম্পর্ক ও তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অজ্ঞতা ছাড়া এ ধরনের ট্যাগ কেউ দিতে পারে না। এই কারণে দেখা যায়, অনেকেই ধারণা করে, ইসলামি ফিকহ, তাফসির এগুলো নিছক কিছু মানুষের কাজ। যারা নিজেদের আবেগ, ধারণা ও স্বার্থের শিকার হয়ে এগুলো সংকলন করেছে। এগুলোর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। এই চিন্তা কেবল জাহালাত আর পূর্ববর্তী সালাফের ব্যাপারে বিষোদগার ছাড়া কিছুই না।

বাস্তবতা হলো, 'ফিকহ' ইসলামি শরিয়াহর বিধানের সমষ্টির নাম। যার মাঝে অধিকাংশই হলো আল্লাহর ওহি। এগুলো জিবরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে এসেছেন কুরআন ও সুন্নাহ আকারে। এখানে কোনো মানুষের কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। এগুলোকে প্রত্যাখ্যান, পরিবর্তন কিংবা সংস্কার করার অধিকারও কারও নেই। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا.

'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যখন কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা করেন, তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে কোনো

ইখতিয়ার বাকি থাকে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা করলে সে তো সুস্পষ্ট গোমরাহিতে পতিত হলো।'[১৮১]

অন্য আয়াতে বলেন,

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ؕ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

'(হে মানুষ!) তোমরা নিজেদের মধ্যে রাসুলের ডাককে তোমাদের পারস্পরিক ডাকের মতো (মামুলি) মনে করো না; তোমাদের মধ্যে যারা একে অন্যের আড়াল নিয়ে চুপিসারে সরে পড়ে, আল্লাহ তাদের ভালো করে জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের ভয় করা উচিত, না জানি তাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হয় অথবা যন্ত্রণাদায়ক কোনো শাস্তি তাদেরকে আক্রান্ত করে।'[১৮২]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

'মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসুল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, তখন তাদের কথা কেবল এটাই হয় যে, তারা বলে, আমরা (হুকুম) শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আর তারাই সফলকাম।'[১৮৩]

আর কিছু বিষয় এমন আছে, যেগুলো সালাফদের ইজতিহাদি তথা গবেষণালব্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। তবে এ ক্ষেত্রে তারা কখনোই স্বাধীন ছিলেন না যে, যা ইচ্ছে তাই বিধান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছেন। আবার এমনও ছিলেন না যে, নিজস্ব কোনো স্বার্থ কিংবা কারও প্রতি আকর্ষণ বা বিদ্বেষী মনোভাব থেকে তারা কোনো

---

১৮১. সুরা আহযাব, আয়াত ৩৬

১৮২. সুরা নুর, আয়াত ৬৩

১৮৩. সুরা নুর, আয়াত ৫১

কিছুকে বিধান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন; বরং এ ক্ষেত্রে তারা কুরআন-সুন্নাহ ও এর থেকে আহরিত নির্দিষ্ট কিছু মূলনীতির কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন। বস্তুত তারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসন্ধানী ছিলেন না। তারা ছিলেন আল্লাহর বিধানের অনুসারী। কুরআন-সুন্নাহর নুসুস নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে তারা নিজেদের প্রবৃত্তি পর্যন্ত নয়, বরং আল্লাহর আনুগত্যের সীমায় পৌঁছার জন্য চেষ্টা করতেন।

এজন্য দেখা যায়, তারা কুরআন-সুন্নাহ থেকে যা জানতেন, তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতেন এবং অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দিতেন। আর যা জানতেন না, সে ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করতেন, কিংবা কেউ জিজ্ঞেস করলে না করে দিতেন। চাই এতে মানুষ জাহেল কিংবা স্বল্প ইলমের অধিকারী মনে করুক না কেন, এ ব্যাপারে তাদের কোনো পরোয়া ছিল না।

আমরা যদি আমাদের সালাফে সালেহিনের জীবনী অধ্যয়ন করি, তাহলে দেখব, তারা কারও প্রতি বিদ্বেষ কিংবা আসক্তির জায়গা থেকে ইলম তলব করতেন না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও আল্লাহর বিধান পর্যন্ত পৌঁছা। এমনকি নারীদের প্রতি বিদ্বেষ রাখতে হবে কিংবা তাদের প্রতি অবিচার করতে হবে—এমন কোনো ধারাও ইসলামি ফিকহ কিংবা তাফসিরের নীতিমালায় নেই। এসব নীতিমালা না পুরুষবান্ধব ছিল, না নারীবান্ধব; বরং এগুলো পরিপূর্ণ শরিয়াহবান্ধব। এজন্য দেখা যায়, ফিকহ ও তাফসিরের ভাণ্ডারে এমনও সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে পুরুষদের বিরুদ্ধে মনে হয়।

আরও মজার বিষয় হলো, কথিত ইসলামি ফেমিনিস্ট বোনেরা আম্মাজান হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তাদের আইডল হিসেবে দেখাতে চান। তারা দাবি করেন যে, হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন একজন ফেমিনিস্ট মহিলা। তিনি নারী-অধিকার নিয়ে পুরুষ সাহাবিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। অথচ দেখা যাবে স্বয়ং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ফতোয়া কিছু কিছু বিষয়ে বাহ্যত (ফেমিনিস্ট) নারীদের বিরুদ্ধেই গিয়েছে। শুধু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাই নন, বরং ইসলামি ইতিহাসে এরকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যেখানে পুরুষদের ফতোয়া নারীদের পক্ষে মনে হলেও নারী স্কলারদের সিদ্ধান্ত তাদের বিরুদ্ধে মনে হবে। আমরা এখানে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি—

১. নামাজের জন্য নারীদের মসজিদে যাওয়ার মাসআলায় হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মত ছিল তারা মসজিদে যাবে না। তিনি বলেছিলেন, 'যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জমানার (সাহাবিদের জমানার কথা বলা হচ্ছে) নারীদের অবস্থা দেখতেন, তাহলে তিনি মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে তাদেরকে নিষেধ করতেন।'[১৮৪] পক্ষান্তরে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত ছিল, মহিলারা নামাজের জন্য মসজিদে যেতে পারবে। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা নারীদেরকে মসজিদে যাওয়া থেকে নিষেধ করো না। তবে তাদের জন্য ঘরে সালাত আদায় করাই উত্তম।'[১৮৫]

২. বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর ওয়ালায়াত (স্বেচ্ছায় বিয়ে সম্পাদনের অধিকার) তথা নারী নিজের বিয়ের আকদ নিজে সম্পাদন করার অধিকারের মাসআলায় হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার অবস্থান ছিল, মহিলাদের কোনো অধিকার নেই নিজের বিয়ে নিজে সম্পাদন করার। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করে, তার বিয়ে বাতিল—তিনি এ কথাটি তিন বার বলেছেন।'[১৮৬] পক্ষান্তরে অন্য হাদিসের আলোকে[১৮৭] ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর মত হলো, সুস্থ বিবেক সম্পন্ন বালেগা নারীর বিবাহের ওয়ালায়াত আছে, যেভাবে তার নিজ সম্পদ ব্যয় করার অধিকার আছে।[১৮৮]

৩. বাইন[১৮৯] তালাকপ্রাপ্তা নারী ইদ্দতের সময়ে স্বামীর জন্য তার বাসস্থান ও ভরনপোষণ দেওয়া আবশ্যক কিনা—এই মাসআলায় হজরত ফাতেমা বিনতে কায়স রাদিয়াল্লাহু আনহার মত ছিল, স্বামীর জন্য উক্ত নারীর বাসস্থান ও ভরনপোষণ করা জরুরি না। পক্ষান্তরে হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত

---

১৮৪. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৮৮৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৮৬৯

১৮৫. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৫৬৭, সনদ সহিহ।

১৮৬. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২০৮৩, সনদ সহিহ।

১৮৭. মুআত্তা মালেক, কিতাবুত তালাক, হাদিস নং ১১৭২, ১১৮২, এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে বিখ্যাত হাদিস বিশারদ শায়খ আবদুল কাদের আরনাউত রহ, বলেন, এর সনদ সহিহ। (জামিউল উসুল, ৭/৫৯৫)

১৮৮. মিরকাত শরহে মিশকাত, ৬/২৬৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

১৮৯. যে তালাকের মাধ্যমে স্ত্রী চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাকে বাইন তালাক বা বিচ্ছিন্নকারী তালাক বলে।

হলো, ওই নারী স্বামীর পক্ষ থেকে বাসস্থান ও ভরনপোষণ পাবে। আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর ফতোয়া হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতের ওপর।[১৯০]

৪. আল মুতাওয়াফফা আনহা তথা যে নারীর স্বামী মারা গেছে, সে নারী ইদ্দত পালন করার সময় স্বামীর পরিবারের পক্ষ থেকে বাসস্থান পাবে কিনা—এই মাসআলায় হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মত হলো, সে স্বামীর পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো বাসস্থানের ব্যবস্থা পাবে না। পক্ষান্তরে হজরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত হলো, ইদ্দত পালনের সময় অবশ্যই স্বামীর পরিবারের পক্ষ থেকে তার থাকার জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে।[১৯১]

৫. স্বামী মৃত্যু শয্যাকালীন সময়ে বাইন তালাকপ্রাপ্তা নারী উত্তরাধিকারের মাসআলাতেও হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মত ছিল, সে স্বামীর পক্ষ থেকে উত্তরাধিকারী হিসেবে কিছু পাবে না। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহর মত হলো, সেই নারী অবশ্যই স্বামীর উত্তরাধিকারী হবে। এমনকি সেই নারী (ইদ্দত পালনের পর) আরেকজন পুরুষের সাথে বিবাহে আবদ্ধ হলেও পূর্বের স্বামীর উত্তরাধিকারী হবে, অর্থাৎ সে আগের স্বামীর উত্তরাধিকারী সম্পত্তি পাবে।[১৯২]

৬. মুরতাদ নারীর ক্ষেত্রে হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মত হলো, তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে মুসলিম তার দীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করো।'[১৯৩] পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত ছিল তাকে হত্যা করা হবে না।

এমন আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে, যেখানে সালাফে সালেহিনের নারী ফকিহদের ফতোয়া বাহ্যত নারীদের বিরুদ্ধে গিয়েছে, কিন্তু পুরুষ ফকিহরা নারীদের পক্ষে মত দিয়েছেন। এই আলোচনা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা নয় যে, কে নারীবাদী আর কে পুরুষতান্ত্রিক ছিলেন! এ ধরনের জঘন্য বাইনারি (বিভাজন) থেকে আমাদের সালাফরা মুক্ত। তারা কোনো মাসআলা প্রদানের ক্ষেত্রে এটা মাথায় রাখতেন না যে, মাসআলাটা নারী বা পুরুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেল কি-না; বরং তাদের মূল মাকসাদ থাকত সত্য পর্যন্ত পৌঁছা।

---

১৯০. তহাবি শরিফ, ৪১৭৪ ও ৪১৯৭ নং হাদিসের ব্যাখ্যাস্থল।
১৯১. বিনায়া শরহুল হিদায়া, ৫/১-১৩
১৯২. আল মুহাল্লা, ১০/৩১৯
১৯৩. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩০১৭, ৬৯২২

বর্তমান সমাজে নারী-পুরুষের মাঝে শত্রুতাপূর্ণ যে বাইনারি আমরা দেখতে পাই, এটা পশ্চিমা সমাজের তৈরি। কথিত ইসলামি ফেমিনিস্ট বোনদের মূল সমস্যা এটাই যে, তারা ফেমিনিজমের তৈরিকৃত নারী-পুরুষের মাঝে বিদ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাবের জায়গা থেকে সালাফে সালেহিনের ফাহম ও ফিকহকে দেখছেন। তারা নিজেদের অধিকার ও দায়িত্বের ধারণাকে পশ্চিম থেকে সরবরাহ করছেন, ইসলাম থেকে নয়। এজন্য তারা নারী-অধিকারের পশ্চিমা কাঠামো দিয়ে ইসলামি শরিয়াহর মুতাওয়ারিস ইলমি ভিতকে পুরুষতান্ত্রিক বলে অপবাদ দিচ্ছেন।

অথচ আমাদের সালাফরা নারী-পুরুষকে একে অপরের শত্রু কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখতেন না। তারা তাই বিশ্বাস করতেন, যা মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'মুমিন নারী-পুরুষরা তো একে অপরের বন্ধু।'[১৯৪] ফিকহের ভাণ্ডারে আমরা এমন অসংখ্য বন্ধুত্ব ও সহযোগিতামূলক সিদ্ধান্ত দেখতে পাব, যেগুলো আমাদের নারীবাদী বোনদের দৃষ্টিতে পড়ছে না। কারণ তারা নিজেদের উৎসকে পরিত্যাগ করে বহিরাগত উৎসের কাছে নতি স্বীকার করে বসে আছে। আর সেখান থেকেই তারা নিজেদের অধিকারের পরিচয় গ্রহণ করছে।

মূলত যারা সালাফে সালেহিনের মুতাওয়ারিস ফাহম ও ফিকহের ওপর আপত্তি তোলে, দেখা যাবে কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক টেক্সট নিয়েই তাদের আপত্তি আছে; কিন্তু তারা সেটা মুখ ফুটিয়ে বলতে পারে না। কিংবা তারা মৌলিক টেক্সটের মনমতো বিকৃত ঘটিয়ে সেই আপত্তি দূর করার ঘৃণ্য প্রয়াস চালায়। আর এ ক্ষেত্রে যেহেতু মূল বাধা সালাফদের মুতাওয়ারিস ফাহম, এইজন্য তারা এটাকে নানাভাবে, নানা ট্যাগ দিয়ে প্রত্যাখ্যান ও গুরুত্বহীন করার চেষ্টা করে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, ইসলামের পুরো জ্ঞান কাঠামোর এক সক্রিয় ও শক্তিশালী সিলসিলা (সনদ) আছে। যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআলা এই দীনকে পরিচ্ছন্নভাবে আমাদের পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত নিয়ে যাবেন। এই সিলসিলা মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের হেদায়াতের জন্য তৈরি করে রেখেছেন। যেন যুগে যুগে মানুষ সত্যের সন্ধান পায় কোনো প্রকার পরিবর্তন ও বিকৃতি ছাড়াই। এখন আমরা যদি এই সিলসিলাকে সঠিকভাবে আঁকড়ে ধরি

১৯৪. সুরা তাওবা, আয়াত ৭১

এবং এটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে সমৃদ্ধ করতে থাকি, তবে একই সাথে আমরা সত্য পথেও থাকতে পারব, আবার আগামী প্রজন্ম পর্যন্ত এই সিলসিলা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে একজন সৌভাগ্যবান সেবকও হতে পারব। আর যদি এই সিলসিলা প্রত্যাখ্যান করি, সেটা আংশিকভাবেই হোক কিংবা পূর্ণাঙ্গরূপে, নিশ্চিতভাবেই আমরা সঠিক ও হেদায়াতের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব এবং পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সালাফে সালেহিন থেকে আসা মুতাওয়ারিস ইলমি ধারায় প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং সালাফে সালেহিনের মতো নেক জীবন দান করুন। আমিন।

দশম সংশয় : পোপতন্ত্র ও ফাহমুস সালাফ

ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য এসেছে। আর কুরআন-সুন্নাহ এই মানবজাতির হেদায়াতের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে। তাই প্রত্যেক মানুষেরই স্বাধীনতা আছে কুরআন-সুন্নাহ থেকে বুঝ গ্রহণ করার এবং নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে ভাবার। যদি কুরআন-সুন্নাহর বুঝ নির্দিষ্ট কোনো প্রজন্ম বা গোষ্ঠী কিংবা নির্দিষ্ট কারও পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল থাকে, তবে এটা পোপতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে যায়। অথচ ইসলামে কোনো 'পোপতন্ত্র' নেই।

নিরসন :

আমরা জানি প্রত্যকে মানুষের চিন্তাভাবনা ও বুঝশক্তি একরকম নয়। আবার মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ব্যক্তির খাহেশাত, চারপাশের পরিবেশ ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হওয়াও প্রমাণিত সত্য। এমতাবস্থায় যদি কুরআন-সুন্নাহ বোঝার জন্য সুস্পষ্ট পদ্ধতি ও মানদণ্ড ইসলামি জ্ঞান-শাখায় না থাকে, তবে মানুষের বিচিত্র ও প্রভাবিত বিবেক শরয়ি নুসুসের ওপর এমন স্বেচ্ছাচারিতা চালাবে, যা দীনে ইসলামকে বিকৃত করে বিলীন করে দেবে। শরিয়াতের শাশ্বত কাঠামোকে খেলনার পাত্রে পরিণত করবে এবং মানব-সমাজ ও চিন্তার ওপর ইসলামি শরিয়াহর কর্তৃত্বকে দুর্বল করে দেবে। নুসুসে শরিয়াহ বোঝার ক্ষেত্রে মানুষ যেন উল্লিখিত বিপদগামিতার পথে ধাবিত না হয়; বরং প্রত্যেকের বুঝ যেন সঠিক প্রবাহে প্রবাহিত হয়, সেজন্য ইসলামি জ্ঞানতত্ত্বে সালাফদের ফাহম ও মানহাজকে

কষ্টিপাথরের মর্যাদা দেওয়া হয়। কারণ তারা ওহি নাজিলের যুগ কিংবা তার নিকটতম সময়ে উপস্থিত ছিলেন। যে সময়টাতে চৌদ্দশ বছর পরের এই আমরা উপস্থিত ছিলাম না। সুতরাং নুসুসে শরিয়াহ বোঝার ক্ষেত্রে সালাফদের ওপর অত্যাবশ্যকীয় নির্ভরতাকে 'পোপতন্ত্র' বলা যায় না। এটাকে পোপতন্ত্র বললে পৃথিবীতে কোনো শাস্ত্রই নিরাপদ থাকবে না। যেকোনো শাস্ত্রীয় টেক্সটকে নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতেই বুঝতে হয়। চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে লিখিত কোনো গ্রন্থকে সাধারণ মানুষ নিজ থেকে পড়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের সঠিক বুঝ লাভ করতে পারবে না; বরং তার মাধ্যমে এই শাস্ত্র চরমভাবে ক্ষতবিক্ষত হবে।

আর ইসলামি শরিয়াহ তো চিকিৎসাশাস্ত্রের অনেক ঊর্ধ্বের বিষয়। অন্যান্য শাস্ত্রের ক্ষেত্রে আমরা এই কথা মানলেও ইসলামের ক্ষেত্রে এসে বিষয়টি বেমালুম ভুলে যাই। মূলত যারা ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রের এই নিরাপদ শৃঙ্খলাবোধকে পোপতন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করে, তারা না ইসলামকে বুঝেছে আর না পোপতন্ত্রকে বুঝতে পেরেছে। পোপতন্ত্রের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। আমরা নিচে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরছি, যার মাধ্যমে পোপতন্ত্র এবং সালাফদের ফাহম ও মানহাজের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার পার্থক্যগুলো খুব সহজেই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

১. পোপতন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট ছিল, তারা শুধু খ্রিষ্টানদের বিকৃত ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যাকার ছিল না; বরং নিজ থেকে আইন প্রণয়ন করত। তা ছাড়া তাদের বক্তব্যের কোনো ধর্মীয় সূত্র থাকত না; বরং তারা যাই বলত সেটাকেই বিধান হিসেবে গণ্য করা হতো। পক্ষান্তরে আমাদের সালাফরা নিজ থেকে কোনো বিধান প্রণয়ন করতেন না; বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তারা যে বুঝ সরাসরি কিংবা এক বা দুই প্রজন্ম পরম্পরায় লাভ করেছেন, সেটাই উম্মতের সামনে প্রকাশ করে গেছেন। এমনকি তাদের বুঝ ও মতের পেছনে আছে সুস্পষ্ট ওহির সূত্র।

২. পোপতন্ত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, পোপরা প্রতিনিয়ত নিজেদের স্বার্থে মানুষের ওপর নিত্যনতুন বিধান চাপিয়ে দিত এবং এই পদ্ধতিতে দুদিন পর পর নতুন নতুন বিধান প্রণয়ন করত। এই বৈশিষ্ট্যের বিচারে মডার্নিস্ট মুসলিমদেরকেই বরং পোপতন্ত্রের অভিযোগ দেওয়া যায়। কারণ তারাই যুগের পরিবর্তনে ইসলামের বিধান পরিবর্তন করার দাবি করে। তারাই নিজের প্রবৃত্তির

স্বার্থে ইসলামের সুস্পষ্ট ও ইজমায়ি বিষয়কে বিকৃত করে নতুন নতুন বিধান প্রণয়ন করার আওয়াজ তোলে। পক্ষান্তরে সালাফদের পথ ও ফাহমের ওপর নির্ভরশীলতা এবং এগুলোর প্রতি শৃঙ্খলা থাকলে নুসুসে শরিয়াহকে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করা এবং যখন-তখন শরয়ি বিধান পরিবর্তন করার পথ বন্ধ হয়ে যায়। এখানে পোপতন্ত্রের মতো ইচ্ছামতো বিকৃতি ও পরিবর্তন আনার কোনো সুযোগই থাকে না। আর আমাদের সালাফরা ব্যক্তিগত স্বার্থে কিংবা কারও চাপে প্রভাবিত হয়ে দীনের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দেননি। নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে এই দীনকে ব্যবহারও করেননি। কাজেই ফাহমুস সালাফ পোপতন্ত্র নয়, বরং এটি হলো নিজেদের ইচ্ছেমতো শরিয়াতকে পরিবর্তনকারী পোপতন্ত্রের বিরোধী বিষয়।

৩. পোপতন্ত্রের আরেকটি অন্যতম দিক হলো, ধর্মশিক্ষা ও ব্যাখ্যার অধিকার কেবল বিশেষভাবে পোপদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই বিশেষ শ্রেণির বাইরে ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা ও পাণ্ডিত্য অর্জনের সুযোগ অন্য কারও জন্য ছিল না। পক্ষান্তরে সালাফদের ফাহম ও বুঝের ওপর নির্ভরশীলতা এবং এগুলোর প্রতি দায়বদ্ধতার ফলে শরয়ি নুসুসের ইলম লাভ কারও জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায় না; বরং উল্লিখিত কষ্টিপাথরকে সামনে রেখে যেকোনো বর্ণের, যেকোনো গোত্রের, যেকোনো পেশার লোক শরিয়াহর ইলম অর্জন করতে পারে এবং এই বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতে পারে। স্বয়ং সালাফদের ভেতরও ইলম অর্জনের ময়দানে পোপতন্ত্রের মতো সংকীর্ণতা ছিল না; বরং মনিব, দাস, খলিফা, জনগণ, কাজি, শ্রমিক নির্বিশেষে সকলের জন্যই ইলম অর্জনের দরজা উন্মুক্ত ছিল। এর বাইরে প্রজন্ম ও যুগ ভিত্তিক তাদের ওপর যে নির্ভরতার নির্দেশনা ইসলামি জ্ঞানতত্ত্বে বিবৃত হয়েছে, সেটিও কারও স্বার্থ কিংবা মূলনীতিহীন পদ্ধতির কারণে নয়; বরং কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনাসহ যৌক্তিক ও বাস্তব কিছু কারণেই সালাফদের এই শ্রেষ্ঠত্ব অনিবার্যতা লাভ করেছে। যা পূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি।

সুতরাং দীনে ইসলাম বোঝার ক্ষেত্রে সালাফের ফাহম ও মানহাজের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সেই শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি আহবান করার ফলে আলেম-সমাজকে কখনোই পোপতন্ত্রের সাথে মিলানো যায় না। আমরা যে তিনটি তুলনা এখানে উল্লেখ

করলাম, এর মাধ্যমে এ বিষয়টি একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যারা সালাফের ফাহম ও মানহাজের ওপর নির্ভরশীলতা ও এগুলোর প্রতি দায়বদ্ধতাকে পোপতন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করতে চায়, তারা আসলে নিজেদের এ দাবির ব্যাপারে সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ না।

একাদশ সংশয় : মাকাসিদে শরিয়াহ ও ফাহমুস সালাফ

সালাফদের মুতাওয়ারিস ফাহম ও মানহাজকে পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে অনেকেই ফিকহের ইজতিহাদি কিছু মূলনীতির আশ্রয় নেন। যেমন মাকাসিদে শরিয়াহ ও মাসলাহাতকে সাইনবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করে শরিয়াতের স্বতসিদ্ধ, প্রসিদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যাকে পরিবর্তন করার দাবি তোলেন। আমরা এখন এই দুটি বিষয়ের সংশয় নিয়ে আলোচনা করব।

সংশয় : এ যুগের নামধারী কিছু আলেমরা বলে বেড়ায় যে, মাকাসিদ হলো মূল। ইসলাম এসেছেই মাকাসিদে শরিয়াহ বাস্তবায়নের জন্য। সুতরাং মাকাসিদে শরিয়াহর আলোকে সালাফদের সিদ্ধান্তগুলো আমাদের পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং উম্মাহর কল্যাণের দিকে লক্ষ রেখে আমাদেরকে বর্তমান যুগের সাথে মানানসই ফিকহ আবিষ্কার করতে হবে।

নিরসন :

ইসলামি শরিয়াহর উসুলের দুটি দিক আছে। একটি মৌলিক দিক, অপরটি ইজতিহাদি দিক। মৌলিক উসুলগুলো হলো—কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মাহর ইজমা। আর ইজতিহাদি দিক হলো—কিয়াস, মাকাসিদে শরিয়াহ, মাসলাহাত ইত্যাদি। যে বিধানগুলো মৌলিক উসুল দ্বারা প্রমাণিত হয়ে আছে, সেখানে ইজতিহাদি মূলনীতি দিয়ে কোনো প্রকার পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করা যাবে না।

এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মাকাসিদে শরিয়াহ কোথায় কার্যকর হবে। কালের আবর্তনে যখন নতুন কোনো বিষয় আমাদের সামনে আসে এবং কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার কোনো বক্তব্য পাওয়া না যায়, তখন নতুন আপতিত বিষয়ের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য কিয়াস ও মাকাসিদের আলোকে গবেষণা করতে হয়। এটা হলো মাকাসিদে শরিয়াহর কর্মসীমা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আধুনিক কিছু স্কলার ও মুসলিম মাকাসিদে শরিয়াহর দোহাই দিয়ে ইসলামি শরিয়াহর মানসুস (নস দ্বারা প্রমাণিত), মুসতামবাত (উম্মাহর মুজতাহিদে কেরামের গবেষণা দ্বারা উন্মোচিত) ও স্বীকৃত অনেক মাসায়েলে পরিবর্তন সাধন করছে।

শরিয়াতের মাকাসিদ হলো উবুদিয়্যাত, তথা আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনের মাধ্যমে তাঁর ইবাদত করা। যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম পালনের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত থাকে, সে মাকাসিদে শরিয়াহ পুরোপুরি অর্জন করতে সক্ষম। উবুদিয়্যাত ব্যতীত কেবলই মাসলাহাত মাকাসিদের শরিয়াহর উদ্দেশ্য নয়। তথাপি আলেমগণ জাগতিক দিক থেকে ইসলামি শরিয়াহর মৌলিক পাঁচটি মাকসাদ বর্ণনা করেছেন—

১. দীনের সংরক্ষণ

২. জীবনের নিরাপত্তা

৩. মানসম্মানের হেফাজত

৪. বিবেক-বুদ্ধির সুরক্ষা

৫. সহায় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ

ইসলামি শরিয়াহর প্রতিটি বিধানের পেছনে এই মাকসাদগুলো সংরক্ষিত হয়। যদি শরিয়াহর বিধানগুলো বাস্তবায়িত হয়, তবে মৌলিকভাবে এই মাকসাদগুলোও পাওয়া যাবে। আর যদি শরিয়াহর বিধান বাস্তবায়িত না হয়, তাহলে এই মাকসাদগুলোও পাওয়া যাবে না। এটাই হলো মাকাসিদের পেছনে প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি।

কিন্তু আমাদের আধুনিকমনা ভাইয়েরা শরিয়াহর মানসুস ও স্বীকৃত বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে মাকসাদগুলো সামনে রেখে ইসলামি শরিয়াহর

স্বীকৃত বিধান পরিবর্তন করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। আল্লামা তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর ভাষায় তাদের যুক্তি হলো, 'নসগুলো মূলত এ সকল মাকাসিদ অর্জনের জন্যেই এসেছে। ফলে যখন আহকামসমূহের আপাত ফলাফল মাকাসিদের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হবে, তখন আমরা বাহ্যিক নসের ওপর আমল না করে উল্লিখিত মাকসাদগুলো অর্জনের চেষ্টা করব।' এ ধরনের যুক্তি-কাঠামো মূলত পুরো শরিয়াতকেই নাকচ করে দেয় এবং অনুমাননির্ভর ও আপেক্ষিক মাকাসিদের ভিত্তিতে আবদিয়্যাতের রশ্মিকেই নিভিয়ে দেয়।

সত্য কথা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য দীনের যেসব বিধিবিধান দান করেছেন, তা কোনো না কোনো উপকারী লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই দিয়েছেন। তিনি কোনো ক্ষতিকর বা উপকারহীন অপ্রয়োজনীয় বিধান আমাদের দেননি। কিন্তু মাকাসিদ ও মাসালিহ কথাগুলো খুবই আপেক্ষিক। একজন মানুষ যেটাকে মাসলাহাত (কল্যাণকর) মনে করছে, অন্যজন সেটাকে নিজের জন্য মাসলাহাত ও মাকসাদ নাও মনে করতে পারে। এজন্য ওহির সূত্র ছাড়া মানবীয় আকল এমন কোনো সার্বজনীন মানদণ্ডে পৌঁছতে পারবে না, যেটা দিয়ে মাকাসিদ ও মাসালিহ চিহ্নিত করা যাবে।

তা ছাড়া শরিয়াহর মাধ্যমে চিহ্নিত মাকসাদগুলোও চিরন্তন ও শাশ্বত না। এগুলোর কিছু নির্দিষ্ট সীমা ও নীতিমালা আছে। উদাহরণস্বরূপ প্রাণ রক্ষার কথাই ধরা যাক। নিশ্চয় এটা শরিয়াহর গুরুত্বপূর্ণ মাকাসিদের অংশ। কিন্তু একজন খুনি জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে মাকাসিদের কথা বলে তার জীবন ভিক্ষা পাবে না। এ কথা সকল মাকাসিদে শরিয়াহর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এখন মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে, এ সকল মাকাসিদ নির্ধারণ কে করবে? এবং সে অনুযায়ী প্রায়োগিক শর্ত ও সীমাগুলো কে নির্ধারণ করবে?

আমরা যদি এই নির্ধারণ-ক্ষমতাকে কেবল মানবীয় আকলের ওপর ন্যস্ত করে দিই, তাহলে বড় বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। শরিয়াত অনেক ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিধান প্রদান করেছে, যা কেবল যৌক্তিকতা দিয়ে বোঝা সম্ভব না। যদি মানবীয় প্রজ্ঞা এ সকল বিষয় সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হতো, তাহলে রাসুল ও ওহি প্রেরণের কোনো দরকার ছিল না। সত্য হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহকে এড়িয়ে এ সকল মাকাসিদ নির্ধারণের কোনো উপায় নেই। তাই কোনোভাবেই এসব আপেক্ষিক ও দ্ব্যর্থবোধক মাকাসিদকে আমরা কোনো পরিচ্ছন্ন আহকামের ওপর প্রাধান্য দিতে

পারি না, চাই সেই আহকাম কুরআন থেকে আহরিত হোক অথবা সুন্নাহ থেকে। আমাদের এই অধিকার নেই যে, আমরা এ সকল মাকাসিদ ও মাসালিহকে শরিয়াহর মৌলিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করব এবং এগুলোর ভিত্তিতে শরিয়াহর নুসুসকে ছুঁড়ে ফেলব।[১৯৫]

মাকাসিদে শরিয়াহর ওপর আলোচনা ও পর্যালোনাকারী কিছু মহলের দৃশ্য হলো এমন যে, তারা যেকোনো প্রকার মুনাসাবাতের কারণেই কোনো বিষয়কে মাকাসিদ সাব্যস্ত করে বসে এবং এর বিপরীত প্রমানিত শত মাসআলা ও বিধানে সংস্কারের শোরগোল শুরু করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, কুরআন-সুন্নাহতে কোনো বিষয়ের হুকুম দেওয়া হয়েছে, কিংবা কোনো বিষয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আর উক্ত বিষয়ে ঘটনাক্রমে কোনো বাহ্যিক কল্যাণকর অথবা ক্ষতিকর দিক রয়েছে। এখন উক্ত কল্যাণকে অর্জন কিংবা উক্ত ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকাকে মাকসাদ বানিয়ে এর ভিত্তিতে সমাধান ও সংস্কারের কাজ শুরু করে দেওয়া হচ্ছে।

সাধারণত দেখা যায়, মাকাসিদে শরিয়াহর নামে এখানে কেবল গাইরে মানসুস (সুস্পষ্ট নস দ্বারা প্রমাণিত নয়) মাসায়েলেই বিধান জারি করা হচ্ছে না; বরং মানসুস (সুস্পষ্ট নস দ্বারা প্রমাণিত) মাসায়েলকেও বলির পাঠা বানানো হচ্ছে। যেখানেই কোনো মাসআলা উক্ত ধারণাকৃত মাকসাদের বিপরীত মনে হচ্ছে, সেখানেই পরিবর্তন বা সংস্কারের আওয়াজ তোলা হচ্ছে। চাই সেই মাসআলা মানসুস অথবা মুত্তাফাক আলাইহি (সর্বসম্মত) হোক না কেন?

উদাহরণস্বরূপ, শান্তি, নিরাপত্তা সংক্রান্ত নুসুসগুলো দেখে ধরে নেওয়া হলো—শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবতার মাঝে স্বাধীনতা ও সমতা বজায় রাখা মাকসাদে শরিয়াহ। এখন মুরতাদ হত্যার বিধান, জিহাদের বিধান, জিম্মির বিধান, কাফেরদের সাথে আন্তরিক ভালোবাসা ও সম্পর্কের নিষেধাজ্ঞা, পুরুষের তুলনায় মহিলাদের সাক্ষী, দিয়্যাত ও মিরাসের অংশ কম হওয়া ইত্যাদি মাসআলা যেহেতু উক্ত ধারণাপ্রসূত মাকসাদের মানদণ্ডে পরিপূর্ণ উত্তীর্ণ হয় না, এজন্য এখন উক্ত মাকসাদের সীমা নির্ধারণ ও তাতে পুনর্বিবেচনা না করার পরিবর্তে মানসুস মাসায়েলকেই পরিবর্তন করতে শুরু করে। এর জন্য তাবিল ও তাহরিফের নতুন

---

১৯৫. উসুলুল ইফতা লি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি, পৃষ্ঠা ২৪৫-২৪৮, মাকতাবাতুল আফকার থেকে প্রকাশিত নুসখা।

নতুন এমন পন্থা বের করা হয়, যেন কোনোভাবেই এই মাসআলা ধারণাপ্রসূত মাকসাদের বিরুদ্ধে না যায়।[১৯৬]

অথচ মাকাসিদের ইমামদের উসুল হলো, মাকাসিদের ভিত্তিতে উসুল তো দূরের বিষয়, কোনো শাখাগত বিধানকেও বাতিল বা পরিবর্তন করা যাবে না; বরং তা আলাদা মূলনীতির আলোকে নিয়ে আসতে হবে। ইমাম শাতেবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি শরিয়াতের মৌলিক বিষয় উপেক্ষা করে শাখাগত বিষয় গ্রহণ করবে, সে যেমন ভুল কাজ করবে; তেমনিভাবে যে ব্যক্তি শাখাগত বিষয় বর্জন করে কেবলই মৌলিক বিষয়গুলো আমলে নেবে, সেও ভুল কাজ করবে।'[১৯৭]

তিনি আরও বলেন, 'সর্বোচ্চ অনুসন্ধানের পর যখন কোনো একটি সাধারণ মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, অতঃপর শরিয়াতের অন্য কোনো নসের বিধান কোনোভাবে সে মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তখন উভয়টির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা আবশ্যক। কারণ শরিয়াহ প্রবর্তক সাধারণ মূলনীতিসমূহের প্রতি সচেতন থেকেই শাখাগত এই বিধান প্রদান করেছেন।'[১৯৮]

শুধু তাই নয়, যদি সাধারণ মূলনীতি আর শাখাগত বিধানে সমন্বয় সাধন সম্ভব না হয়, তাহলে শাখাগত বিধানকে বাতিলকে করা যাবে না; বরং তখন সেই শাখাগত বিধানই স্বতন্ত্র মূলনীতির স্থান লাভ করবে।[১৯৯]

যেমন আধুনিক কিছু স্কলার মুরতাদের হদকে অস্বীকার করেন এই যুক্তিতে যে, এই বিধান শাখাগত একটি বিধান। যা শরিয়াহর মৌলিক মাকাসিদ তথা রহমত, কারও ওপর দীনের ব্যাপারে জোরাজুরি করা যাবে না—এ ধরনের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হচ্ছে। সুতরাং মাকাসিদের আলোকে এই বিধান প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এমনিভাবে কেউ কেউ সদাচারকে শরিয়াহর একটি মাকসাদ বানিয়ে অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছাপ্রদান হারাম হওয়ার ইজমাকে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে। একই যুক্তি জিযিয়ার ক্ষেত্রেও দেখানো হচ্ছে। অথচ এই বিধানগুলো

---

১৯৬. মুফতি উবায়দুর রহমান পাকিস্তানিকৃত 'মাকাসিদে শরিয়ত কী আহমিয়্যাত আওর উস কে হুদুদ ওয়া জাওয়াবেত' নামক উর্দু মাকালা থেকে গৃহীত।

১৯৭. আল মুওাফাকাত, ৩/৮

১৯৮. আল মুওয়াফাকাত, ৯/৩

১৯৯. প্রাগুক্ত, ৩/৪৫

শরিয়াহর পৃথক নস ও মূলনীতি দ্বারা প্রমাণিত। আর নিয়ম হলো, প্রমাণিত কোনো বিধানকে মাকাসিদের দোহাই দিয়ে পরিবর্তন করা যাবে না।

মূলত মাসালিহ ও মাকাসিদ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ থেকেই আহরিত হবে। তাই আল্লাহ এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটিকে কল্যাণ বলেছেন, সেটিই একমাত্র কল্যাণ হিসেবে বিবেচিত হবে। নিজেদের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির খাহেশ অনুযায়ী কল্যাণ নির্ধারিত হবে না। মাকাসিদুশ শরিয়াহ বিষয়ক সকল আলেম, যেমন ইমাম শাতেবি, ইমাম গাজালি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি রহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ সকলেই একমত যে, কোনো হুকুম নির্ভর করে তার নিজস্ব ইল্লতের (কারণের) ওপর, নিছক হিকমত বা প্রজ্ঞার ওপর নয়। তারা এ ব্যাপারেও একমত যে, যেসব মাকাসিদ নুসুসের সাথে সাংঘর্ষিক, সেগুলো কুরআনিক পরিভাষায় কেবল খাহেশাত ছাড়া আর কিছুই না।[২০০]

মাকাসিদ বর্ণনাকারীদের অগ্রদূত আল্লামা শাতেবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'শরিয়াহ এসেছে মানুষকে তাদের প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর প্রকৃত গোলামে পরিণত করার জন্য। এই মূলনীতি যখন প্রতিষ্ঠিত তখন এ কথা বলা যায় না— শরিয়াহ সর্বদা মানুষের খাহেশাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবেই বিধানগুলি তাদের জন্য উপকারী হবে। আল্লাহ পাক সত্যিই বলেছেন, 'যদি হক তাদের খাহেশাতের অনুসরণ করত, তাহলে আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মাঝে যা আছে সবকিছুতে নৈরাজ্য সৃষ্টি হতো।'[২০১]

তিনি আরও বলেন, 'যে মাকাসিদ শরিয়াহর সাধারণ কোনো মূলনীতি বা কোনো বিধানকে আঘাত করে, সেটা প্রকৃতপক্ষে গ্রহণযোগ্য কোনো মাকাসিদের পর্যায়ে পড়ে না।'[২০২]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ পাক যে বিধান দিয়েছেন, সেটা উপেক্ষা করে যদি কোনো ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশিমতো কোনো কিছুকে ন্যায় ও সঠিক মনে করে এবং সে অনুযায়ী মানুষের মাঝে ফায়সালা করাকে বৈধ বলে বিশ্বাস করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।'[২০৩]

---

২০০. উসুলুল ইফতা লি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি, পৃষ্ঠা ২৪৭

২০১. আল মুওয়াফাকাত, ২/৬২

২০২. আল মুওয়াফাকাত, ২/৫৫৬

২০৩. মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাওইয়্যাহ, ৫/১৩০

অনেক আলেমই শরিয়াহর বিধানসমূহের উপকারিতা (মাসালিহ) এবং তার উদ্দেশ্য (মাকাসিদ) নিয়ে কিতাব রচনা করেছেন। তাদের এসব আলোচনার উদ্দেশ্য কখনো এটি ছিল না যে, শরিয়াহর বিধানগুলো কেবল এসব উপকারিতা ও উদ্দেশ্যের মাঝে সীমাবদ্ধ, কিংবা এসব উপকারিতা অর্জন হওয়াই শরিয়াতের মূল লক্ষ্য, শরয়ি নসের কোনো ধর্তব্য নেই। প্রকৃতপক্ষে তাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বোঝানো যে, শরিয়াহর এমন কোনো বিধান নেই, যা দীন অথবা দুনিয়ার উপকারিতা থেকে শূন্য। পাশাপাশি যেসকল ক্ষেত্রে শরয়ি নস (ট্যাক্সট) অনুপস্থিত ও যেসকল বিষয় মুবাহ পর্যায়ের, সে ক্ষেত্রে এ সকল মাসালিহ (কল্যাণ) ও মাকাসিদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি রাখা। তবে কোন বিষয়টা মাসলাহাত, তা নির্ণয় করবে একমাত্র শরিয়াহ ও তার নসসমূহ। কোনো মানুষের অধিকার নেই যে, সে নিজের যৌক্তিকতাবোধ ও খেয়ালখুশির ভিত্তিতে মাসলাহাত নির্ধারণ করবে। কারণ এসব মাকাসিদ (যেমন জীবন, সম্পদ ও সম্মান রক্ষার মূলনীতি) চূড়ান্ত না বা সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য না; বরং মূল কথা হলো ইমাম শাতেবি রহিমাহুল্লাহ যা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'উপকার ও ক্ষতি চিরন্তন না; বরং আপেক্ষিক। এ ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার অর্থ হচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন স্থান-কাল-পাত্রের জন্য উপকার ও ক্ষতি ভিন্ন ভিন্ন।'[২০৪]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যেভাবে কোনো সুন্নাহর ওপর ইজমা হয়ে গেলে তাঁর ওপর আমল ওয়াজিব হয়ে যায়, ঠিক সেভাবে কোনো বিষয়ে আদেশ বা নিষেধ জারি করে এমন ওহিই সেই আদেশ-নিষেধের ওপর আনুগত্য বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্য মহাগুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে যায়। এর ভিত্তিতেই (আল্লাহর) অনুগতদের পুরস্কৃত করা হবে, অবাধ্যদের লাঞ্ছিত করা হবে। সুন্নাহ এটিও আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করে যে, যখন কোনো হুকুম নুসুসের দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং বর্ণনার সনদও বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তখন আমলের ক্ষেত্রে এ সকল মাকাসিদের ওপর নির্ভর করা আমাদের জন্য আর বৈধ থাকে না।'[২০৫]

আল্লামা শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি রহিমাহুল্লাহ তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ

---

২০৪. উসুলুল ইফতা লি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি, পৃষ্ঠা ২৪৫

২০৫. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ-তে শরয়ি আহকামের যেসব ব্যাখ্যা ও কল্যাণের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলোও সর্বোচ্চ রহস্য ও হিকমত হিসেবে এনেছেন। যার ওপরে কখনো শরয়ি হুকুমের ভিত্তি রাখা যায় না। ফলে তাঁর সমকালীন আলেমরা এবং তাঁর পরবর্তী মুসতানিদ আহলে ইলমগণও এই কিতাবকে সর্বদা উক্ত দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখেছেন এবং গ্রহণ করেছেন। এমনকি তার নিকটস্থ সন্তান, নাতি, প্রিয়জন ও ছাত্রদের কর্মপদ্ধতি এমনই ছিল। তাদের কাছে শরয়ি আহকামের মাকাসিদ ও নানাবিধ কল্যাণের ভাণ্ডার ছিল। কিন্তু আমল, ফতোয়া ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তারা সর্বদা উসুলবিদ ও ফুকাহায়ে কেরামের মূলনীতিসমূহের অনুসরণ করেছেন এবং মাকাসিদে শরিয়াহর নামে মানসুস ও মুত্তাফাক আলাইহি মাসআলায় কখনো সংস্কার ও পরিবর্তনের দুঃসাহস দেখাননি। বিশেষত শাহ ওয়ালি উল্লাহর সুযোগ্য সন্তান সিরাজুল হিন্দ শাহ আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ, যাঁকে আল্লাহ তাআলা অসংখ্য গুণাবলি আর বিশেষত্ব দিয়ে ধন্য করেছেন, তাঁর কর্মপদ্ধতিও অনুরূপ ছিল। তাঁর ফতোয়া ও লেখাসমূহ থেকে খুব সহজেই বিষয়টি বোঝা যায়।[২০৬]

সুতরাং মাকাসিদে শরিয়াহর আলোকে কখনোই শরিয়াহর মানসুস, ফকিহদের মুসতামবাত ও স্বীকৃত বিধানকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা ছুড়ে ফেলা যায় না। মাসলাহাতের দোহাই দিয়ে আমাদের সালাফদের ফিকহের ভাণ্ডারকে পশ্চিমা সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত সমাজের সাথে মিলানোর জন্য কাটছাট করা শরিয়াহকে বিকৃত করার নামান্তর।

ইসলামি শরিয়াহর মাকাসিদ ও কল্যাণের ব্যাপারে সালাফদের চেয়ে বেশি কেউ অবগত ছিলেন না। যখন কেউ মাকাসিদ ও মাসালিহের দোহাই দিয়ে সালাফদের ফিকহি সিদ্ধান্তকে ছুড়ে ফেলে, কিংবা শরিয়াহর উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে, তখন সে মূলত সালাফদের ওপর অজ্ঞতার অপবাদ দিচ্ছে; যা থেকে তারা মুক্ত।

সালাফদের বক্তব্যসমূহ মাকাসিদে শরিয়াহকে যথার্থভাবে অনুসরণ করার মাধ্যম। কারণ ইসলামি শরিয়াহ সম্পর্কে তারাই ছিলেন সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী

---

২০৬. মুফতি উবায়দুর রহমান পাকিস্তানিকৃত 'মাকাসিদে শরিয়ত কী আহমিয়্যাত আওর উস কে হুদূদ ওয়া জাওয়াবেত' নামক উর্দু মাকালা থেকে গৃহীত।

এবং শরিয়াহর বিধানসমূহের ব্যাপারে তারাই ছিলেন গভীর বুঝের অধিকারী।[২০৭] নিঃসন্দেহে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িদের মতো সালাফে সালেহিনরাই কুরআন, তার ইলম ও তার ভেতর গচ্ছিত রহস্যের ব্যাপারে অধিক জ্ঞানী ছিলেন।[২০৮]

২০৭. মাকাসিদুশ শরিয়াতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া আলাকাতুহা বিল আদিল্লাতিশ শারইয়্যাহ লিল ইউবি, পৃষ্ঠা ৬০১

২০৮. আল মুওয়াফাকাত, ২/৩৮৯

দ্বাদশ সংশয় : বিচ্ছিন্ন মত ও ফাহমুস সালাফ

বিচ্ছিন্ন মতও তো সালাফদের কারও বক্তব্য। এটাও তো সালাফদের ফাহমেরই অন্তর্ভুক্ত। ফলে এই মতের অনুসরণের মাধ্যমে তো আমরা সালাফদেরই অনুসরণ করছি!

নিরসন :

সালাফদের ফাহম ও মানহাজ থেকে বিচ্যুত হওয়ার জনপ্রিয় একটি মাধ্যম হলো—সালাফদের কারও কারও বিচ্ছিন্ন মতসমূহের অনুসরণ করা এবং স্বীকৃত মতকে প্রত্যাখ্যান করা। এ ক্ষেত্রে তাদের সুবিধাজনক বক্তব্য হলো উল্লেখিত সংশয়।

শুজুজ বা বিচ্ছিন্ন মতের অনুসরণ এমনই একটি ভ্রান্ত পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ব্যক্তি বুঝতেও পারে না যে, সে সালাফদের মানহাজ ও ফাহম থেকে দূরে সরে গেছে। বর্তমান জমানায় অনেক স্বীকৃত হারাম বিষয়কে বৈধ বানানোর পেছনে এই পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কারণ এই পদ্ধতির মাধ্যমে খুব সহজেই সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করা যায়। মানুষ নির্দিষ্ট কোনো সালাফের বিচ্ছিন্ন মত দেখে খুব সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে যায় এবং সে ভাবতে থাকে যে, এটি ইসলামি ইতিহাসে একটি স্বীকৃত মতবিরোধপূর্ণ বিষয়, যার পেছনে বাহ্যত দলিল আছে। সুতরাং এর অনুসরণ করতে সমস্যা নেই।

ইসলামি ফিকহের সকল ইমামের বিরুদ্ধে গিয়ে শরিয়াতের প্রতিষ্ঠিত ও মীমাংসিত

কোনো মাসআলার বিরুদ্ধে যে মতামত দেওয়া হয়, সেটাকেই শুজুজ বা বিচ্ছিন্ন মতামত বলে। প্রায় ইমামেরই এ ধরনের বিচ্ছিন্ন মত থাকে। ইমামরা শরিয়াহ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দুয়েক জায়গায় হোঁচট খেতে পারেন। এতে তারা মুজতাহিদ ও গবেষক হিসেবে সওয়াব পাবেন। কিন্তু কোনো কোনো ইমামের এমন বিচ্ছিন্ন মতকে তার সমকালীন অন্য ইমামরা চিহ্নিত করে দিয়েছেন এবং তারা উম্মতকে একটি মীমাংসায় পৌঁছে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই মতগুলো ফিকহি তুরাসে প্রত্যাখ্যাত ও অগ্রহণযোগ্য হিসেবেই গণ্য হয়ে আসছে।

প্রত্যেক যুগেই কিছু মানুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় কিংবা ভিন্ন কোনো সভ্যতায় প্রভাবিত হয়ে ফিকহি তুরাস থেকে বেছে বেছে শুজুজ মতসমূহের চর্চা বিস্তার করার চেষ্টা করেছে। যেন ইসলামের সাইনবোর্ডে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যায় কিংবা ভিন্ন সভ্যতার সাথে ইসলামের নামে তাল মিলানো যায়। এই পদ্ধতি একজন মানুষকে কোনো প্রকার সংকোচবোধ ছাড়াই পাপে লিপ্ত করে এবং তাকে ভ্রষ্টতার চরম সীমায় নিয়ে নিক্ষেপ করে। এজন্য আমাদের সালাফরা শুজুজ মতসমূহের অনুসরণ করার ব্যাপারে উম্মাহকে সতর্ক করেছেন এবং এর কঠোর নিন্দা করে গেছেন।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'আলেমদের জাল্লাত অনুসরণকারীদের জন্য দুর্ভোগ।'[২০৯]

সুলাইম আত তাইমি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তুমি যদি প্রত্যেক আলেমের রুখসতসমূহ বেছে বেছে গ্রহণ করো, তাহলে তোমার ভেতর সকল মন্দ একত্রিত হবে।'[২১০]

ইমাম আওযায়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আলেমদের বিচ্ছিন্ন মতগুলো বেছে বেছে গ্রহণ করবে, সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে।'[২১১] এজন্যই কাজি ইসমাইল বিন ইসহাক রহিমাহুল্লাহ এ ধরনের ব্যক্তিকে যিনদিক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ ফাসেক বলেছেন।[২১২]

---

২০৯. মাদখালুস সুনান লিল বাইহাকি, ৬৮৭

২১০. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/১৯৮

২১১. আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, ২০৭০৭

২১২. আল ইনসাফ লিল মারদাওয়ি, ১২/৫০

ইবনে আবদুল বার, ইবনে হাযম, আবুল ওয়ালিদ বাজি রহিমাহুমুল্লাহ-সহ প্রমুখ ইমামরা এই ব্যাপারে ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন।'[২১৩]

কাজি ইসমাইল বিন ইসহাক রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি মুতাদিদের দরবারে প্রবেশ করলাম। সে আমাকে একটি কিতাব দিল। আমি কিতাবটিতে নজর বুলিয়ে দেখলাম যে, এটাতে আলেমদের সকল বিচ্ছিন্ন মত একত্রিত করা হয়েছে এবং সাথে সেসব দলিলও উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো ইমামরা তাদের বিচ্ছিন্ন মতের পক্ষে বর্ণনা করেছেন। তখন আমি বললাম, হে আমিরুল মুমিনিন! এই গ্রন্থের লেখক একজন যিন্দিক। মুতাদিদ বলল, কেন, তার এই হাদিসগুলো কি সহিহ নয়? আমি বললাম, এই হাদিসগুলো সহিহ, কিন্তু যে আলেম নেশা সৃষ্টিকারী নাবিজের বৈধতা দিয়েছেন, তিনি মুতা বিবাহের অনুমোদন দেননি। আবার যিনি মুতা বিবাহের বৈধতা দিয়েছেন, তিনি গানবাদ্য ও নাবিজের বৈধতা দেননি। প্রত্যেক আলেমেরই কিছু জাল্লাত ও বিচ্যুতি থাকে। যে ব্যক্তি আলেমদের এই জাল্লাতগুলো একত্রিত করবে, অতঃপর সেগুলো পালন করতে থাকবে, তার দীন ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর মুতাদিদের নির্দেশে এই কিতাব পুড়িয়ে ফেলা হয়।'[২১৪]

সুতরাং ইমামদের বক্তব্য ও কোনো হাদিসের রেফারেন্স দেখেই বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ নেই। বর্তমানে আমরা দেখছি, গানবাদ্য, ফ্রি-মিক্সিং ইত্যাদি বিষয়ে বিচ্ছিন্ন মতের আশ্রয় নিয়ে কেউ কেউ বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। এগুলোর পক্ষে পূর্ববর্তী কোনো আলেমের বক্তব্য পাওয়া গেলেও ইসলামি ফিকহের তুরাসে এই মতগুলো বিচ্ছিন্ন ও প্রত্যাখ্যাত হিসেবেই বিবেচিত হয়ে আসছে। এজন্য দেখা যায়, আইম্মা ও ফুকাহায়ে কেরাম গানবাদ্য, ফ্রি-মিক্সিং ইত্যাদি বিষয়ের অবৈধতা বর্ণনা করতে গিয়ে ইজমার দাবি করেছেন।[২১৫] এগুলোর বৈধতার পক্ষে যে কারও মত আছে সেগুলো তারা জানতেন না—ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয়। তারা ঠিকই জানতেন,

---

২১৩. জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি, ২/৯১, মারাতিবুল ইজমা লি ইবনি হাজম, ৮৭, আরও দেখুন : আল মুওয়াফাকাত লিশ শাতেবি, ৪/১৩৪

২১৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৩/৪৬৫; আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, ২০৭১০

২১৫. মিউজিক অবৈধতার ব্যাপারে জানতে দেখুন : ইসলাম আওর মুসিকি, লেখক মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহিমাহুল্লাহ। এ বিষয়ে বাংলাগ্রন্থ : পিচ্ছিল পাথর, ইজ মিউজিক হালাল? ।

ফ্রি-মিক্সিংয়ের অবৈধতার ব্যাপারে জানতে পড়ুন : আল ইখতিলাত তাহরির ওয়া তাকরির ও তাকিব, লেখক শায়খ আবদুল আজিজ আত তারেফি। বইটি ফ্রি-মিক্সিং ও ইসলাম নামে বাংলায় অনূদিতও হয়েছিল।

কিন্তু এই মতগুলো গ্রহণযোগ্য ও বৈধ ইখতিলাফ বা মতবিরোধ হিসেবে গণ্য হয়নি ইসলামি ফিকহের তুরাসে। ফলে কারও কারও বৈধতার মত দেখে বিভ্রান্ত হয়ে এই কথা বলা যাবে না যে, এগুলো হারাম হওয়ার ওপর ইজমার দাবি সঠিক নয়। কারণ বিচ্ছিন্ন মত কখনো ইজমাকে বাতিল করতে পারে না। ইজমাকে বাতিল করার জন্য বৈধ ইখতিলাফ বা এমন কোনো মত প্রয়োজন, যেটা ইসলামি ফিকহের তুরাসে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

বর্তমানে সালাফদের ফাহম ও মানহাজ থেকে সরে আসার সবচেয়ে কৌশলী ও ভয়াবহ একটি পদ্ধতি হলো, রুখসত ও জাল্লাতের অনুসরণ। বিচ্ছিন্ন মতের অনুসরণের ক্ষেত্রে বাহ্যত সালাফদের ফাহমের অনুসরণ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি সালাফদের ফাহমকে পরিত্যাগ করার নামান্তর।

ত্রয়োদশ সংশয় : সংস্কার ও ফাহমুস সালাফ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَن يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا.

'প্রত্যেক শতকে মহান আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের জন্য একজন মুজাদ্দিদ পাঠাবেন। যিনি উম্মতের সামনে এই দীনকে নবায়ন বা সংস্কার করবেন।'[২১৬]

এই হাদিসের আলোকে বোঝা যায়, মুসলিম উম্মাহর জন্য পূর্ববর্তীদের ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করা উচিত নয়; বরং প্রত্যেক শতকে মুসলিম উম্মাহর চিন্তাকে নবায়ন করতে হবে। আজকে মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় সংকট হলো, তারা তাজদিদকে ছেড়ে দিয়েছে। পূর্ববর্তীদের স্থবির ফিকহকে তারা বর্তমানে প্রয়োগ করতে চাচ্ছে। ইসলামকে বর্তমান যুগে বিজয়ী ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য সংস্কারের মনোভাব নিয়ে, নুসুসে শরিয়াহ নিয়ে যুগের আলোকে নতুন করে ভাবতে হবে।

নিরসন :

প্রথমত, যারা এই আপত্তি করেন, তারা হাদিসে বর্ণিত তাজদিদের মর্মই বোঝেননি। উল্লিখিত হাদিসে তাজদিদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সময়ের পরিবর্তনে

---

২১৬. সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং ৪২৯১, সনদ সহিহ।

মুসলিমদের ভেতর দীন ও আমল সম্পর্কে উদাসীনতা তৈরি হয়। তারা তখন এই দীনের আমল ও তাকে বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব থেকে দূরে চলে আসতে থাকে। দীনের নামে বিভিন্ন ভ্রান্ত ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ইসলামি শরিয়াহকে বিকৃত করতে থাকে এবং এর সাথে বিভিন্ন ভ্রান্ত বিষয়কে যুক্ত করতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের মধ্যে কোনো মুজাদ্দিদ পাঠান। যিনি এই দীনকে আবার তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেবেন। দীনের মাঝে সৃষ্ট নতুন বিষয় ও তাহরিফকে দূর করবেন। উম্মাহকে আবার দীনের ওপর নিয়ে আসবেন। ইসলাম পালনের জন্য তাদেরকে আবার জাগিয়ে তুলবেন। এটাই হলো তাজদিদের মর্ম।

আল্লামা আলকামি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তাজদিদের অর্থ হলো কুরআন-সুন্নাহ ও তার চাহিদা অনুযায়ী যে আমল মানুষ থেকে হারিয়ে গেছে, সেটাকে পুনরুজ্জীবিত করা। আল্লামা মুনাভি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হাদিসে দীন নবায়ন করার দ্বারা বোঝানো হয়েছে মুজাদ্দিদ সুন্নাত থেকে বিদআতকে সুস্পষ্ট করে দেবেন, মানুষের ভেতর ইলম বৃদ্ধি করবেন, আহলে ইলমের সাহায্য করবেন এবং আহলে বিদআতকে পরাজিত ও অপদস্থ করবেন।'[২১৭]

মোল্লা আলি কারি রহিমাহুল্লাহও তার বিখ্যাত মিরকাতুল মাফাতিহ্ গ্রন্থে একই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। সুনানে আবু দাউদের বিখ্যাত শরাহগ্রন্থ আওনুল মাবুদে আল্লামা শামসুল হক আযিমাবাদি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তাজদিদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কুরআন-সুন্নাহর যে আমল ও চাহিদা প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে, তাকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং বিদআত ও নব্য উদ্ভাবিত ভ্রান্ত বিষয় নির্মূল করা।'

মুজাদ্দিদের প্রধান কিছু বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'মুজাদ্দিদকে অবশ্যই দীনের সার্বিক ইলমের অধিকারী হতে হবে। সুন্নাতের সহায়তাকারী ও বিদআত নির্মূলকারী হতে হবে এবং তার জমানার লোকদের সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে।'[২১৮]

অন্যান্য হাদিস থেকেও তাজদিদের উল্লিখিত ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন এক হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরাবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিত অবস্থায়। এটি আবার সে অবস্থায় ফিরে যাবে, যেভাবে তার সূচনা হয়েছিল। তাই অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! তারা

---

২১৭. ফায়জুল কাদির, ২/২৮১; আল মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল কুবরা।

২১৮. আওনুল মাবুদ, ১১/৩৯১

কারা? তিনি বললেন, যখন মানুষের অবস্থা মন্দ হয়ে যাবে তখন যারা তা সংশোধনের কাজ করবে।'[২১৯]

উল্লিখিত প্রতিটি বর্ণনা থেকেই স্পষ্ট, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তাজদিদ হলো, মুসলিমদের অধঃপতনের সময় তাদেরকে কুরআন-সুন্নাহর ওপর উঠিয়ে আনা এবং মুসলিমদের খুলাফায়ে রাশেদিন তথা সালাফদের প্রথম যুগের আদর্শের দিকে ফিরিয়ে নেওয়া।

সুতরাং তাজদিদ দ্বারা কখনোই এটা উদ্দেশ্য নয় যে, সালাফদের ফাহম ও মানহাজ ছেড়ে প্রত্যেক জমানার লোকেরা যার যার মতো শরিয়াহকে পরিবর্তন করবে। প্রত্যেক যুগে যুগে নুসুসে শরিয়াহর নতুন নতুন ব্যাখ্যা আবিষ্কার করবে। এইভাবে তো আল্লাহর শরিয়াহ মানুষের হাতে খেলনার পাত্রে পরিণত হবে। যে যার মতো দীনের বিধানকে ব্যাখ্যা করবে। এভাবে আল্লাহর দীন পরিবর্তন হতে হতে একপর্যায়ে হারিয়ে যাবে।

মূলত যারা তাজদিদ, সংস্কার ইত্যাদির নামে আল্লাহর দীনকে পরিবর্তন করতে চায়, তাদের হাত থেকে শরিয়াহকে রক্ষা করার জন্যই মহান আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে মুজাদ্দিদ পাঠিয়ে থাকেন। মুজ্জাদ্দিদের কাজ হলো, শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের মুসলিমরা যেভাবে এই দীন বুঝেছেন এবং আমল করেছেন, উম্মাহকে সেভাবে পুনরুজ্জীবিত করা। যারা যুগের ভ্রান্ত চিন্তা ও কাফেরদের বিজয়ী সভ্যতায় প্রভাবিত হয়ে যুগকে পরিবর্তন করার পরিবর্তে ইসলামকেই পরিবর্তন করতে চায়, তাদের অপচেষ্টা রুখে দেওয়া। উম্মতকে এ ধরনের ভ্রান্ত অপচেষ্টার ব্যাপারে সচেতন করা।

সুতরাং সালাফদের ফাহম ও মানহাজকে প্রশ্নবিদ্ধ করা কিংবা সেগুলো থেকে উম্মাহকে বিমুখ করা প্রকৃত মুজাদ্দিদের কাজ নয়। উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহকে ফুকাহায়ে কেরাম মুজাদ্দিদ হিসেবে গণ্য করেন। তিনি কখনো সাহাবায়ে কেরাম ও তার পূর্বে গত হওয়া তাবেয়ি আলেমদের ফাহম ও মানহাজের ওপর আক্রমণ করেননি; বরং তিনি তাদের পথকে হেদায়াতের জন্য জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন।

এমনিভাবে আমাদের নিকট অতীতের স্বীকৃত মুজাদ্দিদ হলেন আহমাদ সিরহিন্দি

[২১৯]. সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ২৬৩০; মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৭/২৭৮

রহিমাহুল্লাহ; যাকে আমরা মুজাদ্দিদে আলফে সানি নামে চিনি। তার তাজদিদি কর্মের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই, তিনি সমাজ থেকে বিদআত নির্মূল করেছেন। মুসলিমদের ভেতর যেসব শিরকি বিশ্বাস জন্ম নিয়েছিল, তিনি সেগুলো থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে এনেছেন। বাদশা আকবারের দীনে ইলাহির প্রভাবে যখন ইসলামি শরিয়ায় বিকৃতি সাধনের আশঙ্কা দেখা দেয়, তিনি তখন দীনে ইলাহির বিরুদ্ধে বিপ্লবী দাওয়াহ পরিচালনা করেন। কিন্তু দীনে ইলাহির প্রভাবে তিনি সালাফদের ফাহম ও মানহাজকে প্রশ্নবিদ্ধ করেননি; বরং সালাফদের আদর্শে উজ্জিবীত হয়েছেন। তাদের ফাহম ও মানহাজের আলোকে সমাজকে পরিবর্তন করেছেন। ইসলামি ইতিহাসে সমস্ত মুজাদ্দিদের কাজের নমুনা এর ব্যতিক্রম ছিল না।

বর্তমানে তাজদিদের নামে ইসলামি শরিয়াহর মুতাওয়ারিস উসুল ও ফুরুয়ের ওপর যে নৈরাজ্য করা হচ্ছে, তার সাথে হাদিসে বর্ণিত তাজদিদের কোনো সম্পর্ক নেই। বিকৃত এই তাজিদিদি কর্ম ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার পরিবর্তে ইসলামি শরিয়াহকে ধ্বংস করবে, ফুনুনে শরিয়াহর ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দেবে। আর মুসলিমদেরকে কুরআন-সুন্নাহমুখী করার পরিবর্তে বিভ্রান্ত করবে, ইসলাম-বিরোধী সভ্যতার অনুগত বানাবে। এজন্য কথিত এই তাজদিদের দাওয়াত এক ভয়াবহ দাওয়াত। যার স্লোগান মিষ্ট হলেও এর পুরোটাই ইসলাম ধ্বংসের উপাদানে ভরপুর।[২২০]

প্রকৃতপক্ষে মডার্নিস্টদের এই তাজদিদি আন্দোলন রেনেসাঁর যুগে মার্টিন লুথারের রিফরমেশন আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত। ইউরোপের সংস্কার আন্দোলন ছিল একই সাথে রাজনৈতিক, বংশগত ও মতাদর্শ-কেন্দ্রিক দ্বন্দ্বের ফল। এর সাথে ছিল পোপতান্ত্রিক ব্যবস্থার নানা জুলুম, আধিপত্য ও অনৈতিকতার প্রভাব। যার সাথে ইসলামি জ্ঞানতত্ত্বে সালাফে সালেহিনের স্বীকৃত অথরিটির কোনো মিল নেই। আমরা ইতঃপূর্বে বিষয়টি সুস্পষ্ট করে এসেছি। সুতরাং ইউরোপের খ্রিষ্টবাদের অভিজ্ঞতাকে মুসলিম বিশ্বে ইসলামি জ্ঞানতত্ত্বে প্রয়োগ করা ভ্রান্তি ছাড়া কিছুই না। কারণ দুটো প্রেক্ষাপটের মাঝে পদ্ধতিগত, উৎসগত, রাজনৈতিক ও আদর্শিক চরম বৈপরীত্য বিদ্যমান।

---

২২০. এই আলোচনা শায়খ মাহমুদ আত তাহহান হাফিজাহুল্লাহ এর মাফহুমুত তাজদিদ বাইনাস সুন্নাতিন নবাউইয়্যাহ ওয়া বাইনা আদইয়াইত তাজদিদিল মুআসিরিনা নামক গ্রন্থ থেকে অনুপ্রাণিত।

চতুর্দশ সংশয় : বিজ্ঞান ও ফাহমুস সালাফ

আধুনিক অনেক মুসলিমকে আমরা বলতে শুনি যে, বর্তমান বিজ্ঞান অমুক কথা বলছে, যা সালাফদের মতের বিরোধী। এজন্য আমাদের নুসুসে শরিয়াহকে সালাফদের বুঝ বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের আলোকে বুঝতে হবে। কারণ আগেকার যুগে বর্তমানের মতো বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়নি। যার ফলে সালাফরা এসব বিষয় বুঝতে পারেনি, কিংবা তাদের কাছে বিষয়গুলো বর্তমানের মতো স্পষ্ট হয়নি। এখন বিজ্ঞান এসে অনেক বিষয়ই আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছে।

নিরসন :

বিজ্ঞান শব্দটা অনেক ব্যাপক। এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা আছে। বিজ্ঞানের প্রধান দুটি শাখা হলো—'সামাজিক বিজ্ঞান' ও 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান'। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আবার অনেক শাখা আছে। এর মধ্যে পদার্থ, রসায়ন, মহাকাশ, চিকিৎসা, জীববিজ্ঞান অন্যতম।

এবার ইসলামের আলোকে আমরা বিজ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করব। আর সেটা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিসের ভিত্তিতে। হজরত রাফি ইবনে খাদিজ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করে মদিনাবাসীদেরকে খেজুর গাছে পরাগায়ন (পরাগধানী থেকে পরাগ রেণু স্থানান্তরিত হয়ে ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হওয়াকে পরাগায়ন বলে) করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা

এটা কী করো? উত্তরে বলা হলো, আমরা এমন করে থাকি। তিনি বললেন, এমন না করলে হয়তো ভালো হবে। অতঃপর তারা এ কাজ ছেড়ে দিল। এতে খেজুরের ফলন ভালো হলো না। তারা এ সংবাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৌঁছালে তিনি বললেন, 'আমি তো একজন মানুষ। যখন তোমাদের দীন সম্পর্কীয় কোনো বিষয়ে আদেশ করি, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করবে। আর যখন আমার ব্যক্তিগত অভিমত হিসেবে কোনো কিছু বলি, তখন তা মান্য করা আবশ্যক নয়। কেননা আমি তো একজন মানুষ।'[২২১] অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে তিনি বলেন, 'তোমরা তোমাদের দুনিয়াবি বিষয়ে খুব ভালো জানো।'[২২২]

যে বিষয়গুলো শরয়ি ইলমের সাথে সম্পৃক্ত নয় এবং যে বিষয়ের ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই, এগুলো পার্থিব বিষয়। যেমন আমরা কীভাবে চাষ করব, কীভাবে গাছ রোপন করব, পরিচর্যা করব এই বিষয়গুলো শরয়ি ইলমের সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং এই বিষয়গুলো মানুষের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভরশীল। ফলে মানুষ নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ফলে যে পদ্ধতি উত্তম মনে করবে, সেটাই অনুসরণ করবে।[২২৩]

---

২২১. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৬০৮৩

২২২. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৩৬৩

২২৩. এখানে একটি বিষয় জানিয়ে রাখতে চাচ্ছি যে, পশ্চিমা চিন্তাধারায় প্রভাবিত কিছু লোক উল্লিখিত হাদিস দেখিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা, বিচারকার্য, লেনদেন, আচার-ব্যবহারকে পার্থিব বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করতে চায় এবং এই সংক্রান্ত যত হাদিস আছে, সেগুলোকে অপালনীয় হিসেবে দাবি করতে চায়। অর্থাৎ তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আইনি অথরিটিকে কেবল আকায়েদ ও বক্তিগত ইবাদাতের ভেতর সীমাবদ্ধ করতে চায়। মূলত সেকুলারিজমকে যারা ইসলামি প্রমাণ করতে ব্যস্ত, তারাই এই হাদিসটিকে এভাবে সামনে আনে। কারণ রাষ্ট্র পরিচালনা, বিচারকার্য, লেনদেন ইত্যাদি থেকে সুন্নাতে নববির অথরিটিকে পৃথক করতে পারলে খুব সহজেই পশ্চিমা সেকুলারিজমের সাথে ইসলামকে মিলানো যায়। অথচ হাদিসের মর্ম মোটেও এমন নয়। হাদিসের বক্তব্য ও আগে পরের প্রেক্ষাপট থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, এটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোনো আদেশ বা নিষেধ ছিল না। কেবল তিনি ধারণা করে বলেছিলেন। ফলে এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আকায়েদ ও ব্যক্তিগত ইবাদাতের বাইরে মানবজীবনের বাকি ক্ষেত্রগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল হাদিসকে অপালনীয় দাবি করা বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই না। এই বক্তব্য সেসব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, যে ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট কোনো আদেশ বা নিষেধ দেননি। যেসব ক্ষেত্রে নুসুসে শরিয়াহ বিশেষ নির্দিষ্ট মূলনীতি প্রণয়ন করেছে, কিংবা স্পষ্ট কোনো বিধান জারি করেছে, সেগুলো হাদিসে বর্ণিত দুনিয়াবি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লামা তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ তার হুজ্জিয়তে হাদিস গ্রন্থে এই সমস্ত

এখন আমরা হাদিসটিকে বিজ্ঞানের ওপর প্রয়োগ করব। বিজ্ঞানের যে বিষয়গুলো শরয়ি ইলমের সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলোর ক্ষেত্রে নুসুসে শরিয়াহকে আমরা সালাফদের ফাহমের আলোকেই গ্রহণ করব। আর যে বিষয়গুলো ইসলামের আকায়েদ বা শরয়ি ইলমের সাথে সম্পৃক্ত নয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে পারি। যেমন মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলে দিয়েছেন, তিনি প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা, তিনিই প্রকৃতির সকল কিছু পরিচালনা করেন। কিন্তু তিনি কোন কোন প্রক্রিয়ায় এ সৃষ্টিজগত পরিচালনা করেন, সেটার বিস্তারিত বিবরণ আমাদের জানাননি। অনুরূপ সৌরজগৎ সম্পর্কেও বিস্তারিত বর্ণনা তিনি আমাদের দেননি।

তাই এই জায়গাগুলোতে বিজ্ঞানের এমন ব্যাখ্যা গ্রহণ করার অবকাশ আছে, যেগুলো নুসুসের বিরোধী নয়। অনুরূপ পদার্থ, রসায়ন, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রায় বিষয়ই হাদিসে বর্ণিত উমুরে দুনিয়ার (পার্থিব বিষয়) অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়গুলো মানুষের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভরশীল। ফলে বিজ্ঞানের এই দিকগুলোতে ইসলামি শরিয়াহর বিশেষ কোনো নির্দেশনা নেই। সকল কিছুর মালিক আল্লাহ, সকল জ্ঞান আল্লাহপ্রদত্ত, এই বিশ্বাস রেখে মানুষ এসব বিষয়ে নিজস্ব গবেষণা ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতে যা উত্তম ও কার্যকর মনে করবে, তাই গ্রহণ করা অনুমোদিত হবে, যতক্ষণ তা ইসলামি শরিয়াতের অন্য কোনো বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না ।

পক্ষান্তরে বিজ্ঞানে যেসব বিষয় শরয়ি ইলমের সাথে সম্পৃক্ত এবং যেগুলোর ব্যাপারে নুসুসে শরিয়ায় সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে, সেগুলো আমাদেরকে সালাফদের ফাহম ও মানহাজ অনুযায়ীই গ্রহণ করতে হবে।

সমস্যাটা হলো আমরা এই বিভাজনকে মাথায় রাখি না। যার দরুন দেখা যায়, আমাদের কেউ কেউ ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রের স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য অনেক বিষয়কে অবৈজ্ঞানিক কিংবা বিজ্ঞানবিরোধী বলে নুসুসে শরিয়াহর বিকৃত ব্যাখ্যার দাবি তোলে। উদাহরণস্বরূপ আধুনিক সমাজবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথাই ধরা যাক। সমাজব্যবস্থা বা রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে নুসুসে শরিয়াহর স্বতন্ত্র ও মৌলিক নির্দেশনা ও

লোকদেরকে ইনকারে হাদিসের একটি ক্যাটাগরিতে ফেলেছেন। আল্লামা আশরাফ আলি থানবি রহিমাহুল্লাহও তার বিখ্যাত আল ইন্তিবাহাতুল মুফিদাহ গ্রন্থে এই সমস্ত লোকদের নিন্দা করেছেন।

প্রস্তাব আছে। এগুলো নিছক মানুষের আকল বা অভিজ্ঞতানির্ভর বিষয় নয়। কিন্তু আজকে মুসলিমদের অনেকে পশ্চিমাসমাজ বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোকে নুসুসে শরিয়াহর এমন ব্যাখ্যা করছে, যা সালাফে সালেহিন থেকে প্রমাণিত নয়; বরং এগুলো তাদের বুঝের বিরোধী। গণতন্ত্র, সেকুলারিজম ইত্যাদি ব্যবস্থাকে পরম মনে করে সালাফদের থেকে প্রাপ্ত নুসুসে শরিয়াহর মুতাওয়ারিস ফাহম ও মানহাজকে প্রত্যাখ্যান করছে এবং নুসুসে শরিয়াহর ভ্রান্ত তাবিলের (ব্যাখ্যার) আশ্রয় নিচ্ছে। যেমন ইসলামি শুরাব্যবস্থার কথা আমরা এখানে উদাহরণ হিসেবে আনতে পারি। সালাফে সালেহিন থেকে শুরু করে ইসলামের চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসে যে ব্যাখ্যা আমরা জেনে আসছি তা হলো, আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদি[২২৪] এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত পরিষদের ভিত্তিতে শাসক নিয়োগ ও দেশ পরিচালনাকে শুরায়ি নিজাম বলে; যে পরিষদ কুরআন-সুন্নাহকে দেশ পরিচালনার ভিত্তি হিসেবে মেনে নেয়। কিন্তু কেউ কেউ পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পরম মনে করে ইসলামের শুরাব্যবস্থার গণতান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রদান করছে, যা সালাফে সালেহিনের কারও থেকে প্রমাণিত নয়। অনুরূপ সেকুলারিজমকে ইসলামিকরণের জন্য সালাফে সালেহিনের ফাহমকে পরিত্যাগ করে নুসুসে শরিয়াহর নতুন নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করছে। পশ্চিমা মুক্তচিন্তাকে পরম মনে করে, সালাফে সালেহিনের মতকে উপেক্ষা করে নুসুসে শরিয়াহর উদ্ভট ব্যাখ্যা প্রদান করছে।[২২৫]

অনুরূপ বিবর্তনবাদের বিষয়টিও শরয়ি ইলমের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে নুসুসে শরিয়ায় আমরা সুস্পষ্ট বিবরণ পাই। মানুষের সৃষ্টিকেন্দ্রিক নুসুসে শরিয়াহর ফাহমে মুতাওয়ারিস আমরা সালাফদের থেকে পেয়েছি; কিন্তু বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত অনেক মুসলিম নুসুসে শরিয়াহকে পরম মনে করার পরিবর্তে বিবর্তনবাদকে প্রমাণিত হিসেবে বিশ্বাস করে নিয়েছে। আর সে বিশ্বাসের জায়গা থেকে নুসুসে শরিয়াহকে বিবর্তনবাদের সাথে মিলানোর জন্য নুসুসে

---

২২৪. আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদি হচ্ছেন, আলিম-উলামা, মর্যাদাবান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন বাহিনীর প্রধানগণ, সমাজের নেতাগণ ও বড় ব্যবসায়ীগণ। নারী, চুক্তিবদ্ধ কাফের ও দাসরা যতই মহৎ গুণের অধিকারী হোক না কেন, তারা কখনো আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদির অন্তর্ভুক্ত হবে না। (ইমাম নববির মুগনিল মুহতাজ, ৪/১৩০; ইমাম বাহুতির কাশশাফুল কিনা, ৬/১৫৯)।

২২৫. এর চাক্ষুষ প্রমাণসহ সঠিক ব্যাখ্যা জানতে ইসলাম ও মুক্তচিন্তা বইটি দেখা যেতে পারে। লেখক মাওলানা আফসারুদ্দীন হাফিজাহুল্লাহ।

শরিয়াহর এমন এমন উদ্ভট ব্যাখ্যা আবিষ্কার করছে, যা সালাফে সালেহিন থেকে প্রমাণিত নয়।

এই ভুলগুলো হচ্ছে বিজ্ঞানের উল্লিখিত বিভাজনটি না বোঝার কারণে। নুসুসের সূত্রে সালাফদের থেকে মুতাওয়ারিস যে ফাহম ও মানহাজ আমরা লাভ করেছি, সেগুলো নিছক মানুষের আকল কিংবা অভিজ্ঞতানির্ভর নয়। এই বিষয়গুলোতে আধুনিক বিজ্ঞান নুসুসে শরিয়াহ ও সালাফদের ফাহমের বিপরীতে গেলে কোনো প্রকার তাবিল ছাড়াই আমরা নুসুসে শরিয়াহ ও সালাফদের ফাহমের ওপর বিশ্বাস রাখব। কারণ মানুষের আকল, গবেষণা ও অভিজ্ঞতা পরম কোনো সত্য নয় এবং তা বিভিন্ন ধরনের প্রবণতা ও দুর্বলতা থেকেও মুক্ত নয়। ফলে শরয়ি ইলমের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোর সাথে বিজ্ঞান সাংঘর্ষিক হলে আমরা বিশ্বাস করব, অপূর্ণ জ্ঞান ও নানা সীমাবদ্ধতার কারণে বিজ্ঞান প্রকৃত তত্ত্ব এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি, কিংবা সেই পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

আর যেসব বিষয় শরয়ি ইলমের সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং উমুরে দুনিয়া তথা পার্থিব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, সেসব বিষয়ে মানুষের গবেষণা, অভিজ্ঞতা ও পর্যালোচনাই ধর্তব্য হবে। কারণ এই বিষয়গুলোকে উমুরে দুনিয়া হিসেবে ইসলাম আমাদের জ্ঞানের কাছে ছেড়ে দিয়েছে। যেমনটি হাদিস শরিফ থেকে আমরা জানতে পেরেছি।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমান অনেক মুসলিমই নুসুসে শরিয়াহর বিষয়বস্তুকে বুঝতে ভুল করছে। যার দরুন তারা খুবই নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলভাবে নুসুসে শরিয়ায় এমন বিষয় খোঁজে বা নুসুসে শরিয়াহ থেকে জোরপূর্বক এমন বিষয় প্রমাণ করতে চায়, যা এর বিষয়বস্তু না। যেমন কেউ কেউ কুরআন থেকে সমস্ত বৈজ্ঞানিক থিওরি ও আবিষ্কারকে প্রমাণ করতে চায়। আর এমন একটা হীনম্মন্যতায় ভোগে যে, যদি কুরআন থেকে এগুলো প্রমাণ না করা যায়, তাহলে কুরআন অসম্পূর্ণ বা ছোট হয়ে যাবে। এজন্য তারা একনিষ্ঠভাবে কুরআন থেকে বৈজ্ঞানিক থিওরি প্রমাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যান। আর এটা করতে গিয়ে অধিকাংশ সময় কুরআনের আয়াতের অর্থ ও মর্মকে বিকৃত করে ফেলেন।

অথচ কুরআনের মূল বিষয়বস্তু সাইন্স নয়। যদিও মহান আল্লাহ তাআলা কুরআনের অনেক জায়গায় তাঁর রুবুবিয়াতের প্রমাণস্বরূপ সৃষ্টিগত ও প্রাকৃতিক কিছু বাস্তবতা শিক্ষণীয় হিসেবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এজন্য যদি

কুরআনে (নুসুসে শরিয়ায়) বৈজ্ঞানিক কোনো বাস্তবতা পাওয়া যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদেরকে সেটার ওপরই বিশ্বাস রাখতে হবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কোনো থিওরি পূর্ব থেকেই মাথায় রেখে জোরপূর্বকভাবে কুরআন (নুসুসে শরিয়াহ) থেকে সেটা প্রমাণ করতে যাওয়া—চিকিৎসাশাস্ত্রের কিতাব থেকে আইন শাস্ত্রের বিষয় বের করার মতোই অহেতুক কাজ।

পবিত্র কুরআন তার মূল বিষয়বস্তু ও অবতরণের উদ্দেশ্যে কোনো অস্পষ্টতা রাখেনি। প্রায় ২০টির মতো আয়াতে কুরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তাকে কেন নাজিল করা হয়েছে? উদাহরণস্বরূপ নিম্নে বর্ণিত কিছু আয়াতের দিকে আমরা মনোনিবেশ করতে পারি। সুরা মায়েদার ১৫-১৬ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

> يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ؕ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ. يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَ يَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.
>
> ‘হে কিতাবিগণ! তোমাদের নিকট আমার (এই) রাসুল এসেছে, যে (তাওরাত ও ইনজিল) গ্রন্থের এমন বহু কথা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে, যা তোমরা গোপন করো এবং অনেক বিষয় (তোমাদের থেকে) এড়িয়ে যায়। আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের কাছে এক জ্যোতি এবং এমন এক কিতাব এসেছে, যা সত্যকে সুস্পষ্ট করে। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে; এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন ও দিশা দেন সরল পথের।’

সুরা মায়েদারই ১৯ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

> يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّ لَا نَذِيْرٍ ؗ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.
>
> ‘হে কিতাবিগণ! তোমাদের নিকট এমন এক সময়ে আমার রাসুল

দীনের ব্যাখ্যা দানের জন্য এসেছে, যখন রাসুলগণের আগমন-ধারা বন্ধ ছিল, যাতে তোমরা বলতে না পারো, আমাদের কাছে (জান্নাতের) কোনো সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নাম সম্পর্কে) সতর্ককারী আসেনি। এবার তোমাদের কাছে একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসে গেছে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।'

একই সুরার ৪৮ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ.

'এবং (হে রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) আমি তোমার প্রতিও সত্য সংবলিত কিতাব নাজিল করেছি, তার পূর্বের কিতাবসমূহের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং তাদের মধ্যে সেই বিধান অনুসারেই বিচার করো, যা আল্লাহ নাজিল করেছেন। আর তোমার নিকট যে সত্য এসেছে, তা ছেড়ে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক (উম্মত)-এর জন্য আমি এক (পৃথক) শরিয়াত ও পথ নির্ধারণ করেছি। আল্লাহ চাইলে তোমাদের সকলকে একই উম্মত বানিয়ে দিতেন। কিন্তু (পৃথক শরিয়াত এজন্য দিয়েছেন) যাঁতে তিনি তোমাদেরকে যা-কিছু দিয়েছেন, তা দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। সুতরাং তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করো। তোমাদের সকলকে আল্লাহরই দিকে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদের অবিহত করবেন।'

সুরা আনআমের ৫৫ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَ لِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ.

'এভাবেই আমি নিদর্শনাবলি বিশদভাবে বর্ণনা করি (যাতে সরল পথও স্পষ্ট হয়ে যায়) এবং এতে অপরাধীদের পথও পরিষ্কার হয়ে যায়।'

সুরা সিজদাহর ১-৩ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

الٓمّٓ . تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ . اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ.

'আলিফ-লাম-মীম। রাব্বুল আলামিনের পক্ষ হতে এটি এমন এক কিতাব নাজিল করা হচ্ছে, যাতে কোনো সন্দেহপূর্ণ কথা নেই। লোকে কি বলে নবি নিজে এটা রচনা করে নিয়েছে? না, (হে নবি!) এটা তো সত্য, যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, যাতে তুমি এর মাধ্যমে সতর্ক করো এমন এক সম্প্রদায়কে, যাদের কাছে তোমার আগে কোনো সতর্ককারী আসেনি, যাতে তারা সঠিক পথে এসে যায়।'

এখানে মাত্র কয়েকটি আয়াত আমরা তুলে ধরলাম। এরকম আরও আয়াত পবিত্র কুরআনে আছে; যেগুলো নিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যায়, কুরআনে কারিমের মূল উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে আল্লাহ তাআলার তাওহিদের শিক্ষা দেওয়া, পরকালের জন্য প্রস্তুত করা এবং দুনিয়ার জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক পরিচালনা করার জন্য গাইডলাইন দেওয়া। এর সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা ও প্রাকৃতিক বাস্তবতা আল্লাহ তাআলা তুলে ধরেছেন, সেগুলোও উল্লেখিত উদ্দেশ্যকে শক্তিশালী ও বাস্তবায়নের জন্যই। এজন্য কুরআনে কোনো ঘটনা কিংবা বৈজ্ঞানিক থিওরি পাওয়া না গেলে, সেটা দোষের কিছু না, হীনম্মন্যতায় ভোগারও কোনো বিষয় না। কারণ কুরআন কখনো নিজেকে বিজ্ঞানের গ্রন্থ বলে দাবি করেনি। এটা তার উদ্দেশ্যও না।

কুরআন তার বিষয়বস্তুর বিবেচনায় সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত। এজন্য ইসলাম আমাদেরকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মৌলিক দিকনির্দেশনা দিয়েছে। যেন আমাদের পুরো জীবন আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক পরিচালিত হয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর বিবেচনায় কুরআন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট না; বরং এই দিকটিকে উমুরে দুনিয়া তথা পার্থিব বিষয় হিসেবে কুরআন মানুষের অনুসন্ধান ও গবেষণার

ওপর ছেড়ে দিয়েছে। শর্ত হলো, এই গবেষণার উদ্দেশ্য হতে হবে মানুষের উপকার সাধন ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। তবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার যে বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিকভাবে নুসুসে শরিয়ায় এসেছে, সেগুলোতে নিঃসন্দেহে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, যদিও আধুনিক বিজ্ঞান সেগুলোর বিরুদ্ধে যায়। এ ক্ষেত্রে আমরা মনে করব, বিজ্ঞান তার সীমাবদ্ধতার কারণে প্রকৃত বাস্তবতায় পৌঁছতে পারেনি, কিংবা মন্দ কোনো প্রবণতার শিকার হওয়ার ফলে তার গবেষণা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে গেছে। আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যে বিষয় সুস্পষ্টভাবে কুরআনে বর্ণিত নেই, সেগুলোকে জোর করে, আনএকাডেমিক পদ্ধতিতে, নসের অর্থ ও প্রেক্ষাপটকে ভেঙেচুরে প্রমাণ করতে যাওয়া ভ্রান্তি ছাড়া কিছুই না। এটা নিঃসন্দেহে নুসুসে শরিয়াহর বিকৃতি। আমরা এরকম ভয়াবহ একটা উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি। যখন বিজ্ঞানের এই থিওরি সামনে এল যে, দুনিয়া স্থির নয় বরং ঘূর্ণায়মান, তখন এটাকে কুরআন থেকে প্রমাণ করার জন্য নিম্নের আয়াতটি ব্যবহার করা হলো—

وَ تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ؕ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ.

'আর যখন তোমরা পাহাড়কে দেখবে তখন মনে হবে সেটা স্থির হয়ে আছে। অথচ তা মেঘের মতো চলতে থাকবে।'[২২৬]

এই আয়াতে 'পাহাড় মেঘের মতো চলতে থাকবে' এর অর্থ 'পাহাড় মেঘের মতো চলে' অর্থ করে তারা দাবি করল যে, দুনিয়ার ঘূর্ণমানের থিওরি কুরআন দ্বারাও প্রমাণিত। অথচ এটা মোটেও আয়াতের বিষয়বস্তু না। আয়াতে মোটেও দুনিয়া স্থির না ঘূর্ণায়মান—এ ব্যাপারে কথা বলা হয়নি। আয়াতের কন্টেক্সট (পূর্বাপর) থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, এখানে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। কিয়ামত এতই ভয়াবহ হবে যে, আমরা এতদিন যে পাহাড়গুলোকে স্থির দেখে আসছি, সেদিন এ পাহাড়গুলো আকাশে মেঘের মতো উড়তে থাকবে। এটাই উল্লিখিত আয়াতের প্রেক্ষাপট। কিন্তু কুরআন দিয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সকল থিওরি প্রমাণ করার ভূত মাথায় থাকার কারণে আয়াতের এই প্রেক্ষাপট ও প্রকৃত মর্মকে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। এরকম আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। যেখানে

২২৬. সুরা নামল, আয়াত ৮৮

কুরআন থেকে বৈজ্ঞানিক থিওরি প্রমাণ করতে গিয়ে এভাবেই আয়াতের মর্মের বিকৃতি সাধন করা হয়েছে।

মোটকথা কুরআনে কারিম পদার্থ বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয় এবং পার্থিব উন্নতি অর্জন তার বিষয়বস্তুও নয়। কারণ এই বিষয়গুলো মানুষ নিজের চিন্তাভাবনা, গবেষণা, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উদঘাটন করতে পারবে। এজন্য আল্লাহ তাআলা এই বিষয়গুলো মানুষের মেধা ও পরিশ্রমের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। আর যে বিষয়গুলো নিছক মানুষের আকলের ওপর নির্ভরশীল হতে পারে না, বরং সেখানে ওহির কোনো বিকল্প নেই এবং ওহির দ্বারস্থ হতে হয়, সেগুলোকে নুসুসে শরিয়াহর বিষয়বস্তু বানিয়েছেন। সুতরাং আমাদেরকে ওপরে উল্লেখিত বিভাজনটি বুঝে নুসুসে শরিয়াহ ও বিজ্ঞানের প্রতিটি দিককে স্ব স্ব স্থানে রেখে বিচার করতে হবে। লাগামহীনভাবে বিজ্ঞানকে ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর কিংবা লাগামহীনভাবে বিজ্ঞানের সকল কিছুকে ইসলামি বানানোর প্রচেষ্টা—উভয় প্রান্তিকতা থেকেই বেঁচে থাকতে হবে। সর্বোপরি নুসুসে শরিয়াহকে বিজ্ঞানের আলোকে নয়, সালাফে সালেহিনের ফাহম ও মানহাজ অনুযায়ীই বুঝতে হবে।

উপসংহার

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'আমি এই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই একে সংরক্ষণ করব।'[২২৭] এই আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর প্রেরিত দীনকে কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সার্বিকভাবে দীনে ইসলামকে তাহরিফ (বিকৃতি) ও তাবদিল (পরিবর্তন) থেকে নিরাপদ রাখার জন্য তিনি যে মাধ্যমটি ব্যবহার করেছেন সেটি হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত এই দীন বহনকারী ন্যায়পরায়ণদের একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। আল্লাহ তাআলা ইতঃপূর্বে প্রেরিত অন্য কোনো শরিয়াহ ও দীনি গ্রন্থের সংরক্ষণ করার এত সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেননি। যার দরুন দেখা গেছে, নির্দিষ্ট একটা সময় পার হওয়ার পর সেসব শরিয়াহ ও দীনি গ্রন্থ তার অনুসারীদের হাতে পরিবর্তন ও বিকৃতির শিকার হয়েছে। আর এই পরিবর্তন ও বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করে দীনি গ্রন্থ ও শরিয়াহকে মূল অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য কোনো প্রচেষ্টা এবং ধারাও তাদের ভেতর দেখা যায়নি।

কিন্তু ইসলামি শরিয়াহর ক্ষেত্রে পুরো ব্যাপারটিই ভিন্ন। মহান আল্লাহ তাআলা এই শরিয়াহকে সংরক্ষিত রাখার ওয়াদা করেছেন এবং এ ওয়াদা বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক যুগ ও প্রজন্মে অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক একটি নেটওয়ার্ক সৃষ্টি

---

২২৭. সুরা হিজর, আয়াত ৯

করে দিয়েছেন। ফলে আজ পর্যন্ত কেউ ইসলামকে চিরতরে বিকৃত ও পরিবর্তন করতে পারেনি। কেউ কোনোভাবে দীনে ইসলামের এই মুতাওয়ারিস ধারায় ফাটল সৃষ্টি করতে চাইলে মুসলিম-সমাজে সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, ভ্রান্ত ব্যক্তি বা দল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আল্লাহপ্রদত্ত মুতাওয়ারিস এই ধারা দীনে ইসলামের একটি মুজিযা ও অনন্য বৈশিষ্ট্য। পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য এটি মহান এক নেয়ামত। মুসলিমদের জন্য এটি গর্বের বিষয়, হীনম্মন্যতার নয়। মুসলিম জাতি যদি পবিত্র এই ধারার প্রতি নিবেদিত থেকে ও আত্মবিশ্বাস রেখে দীনের কাজে নিয়োজিত হয়, তাহলে পৃথিবীর কোনো শক্তি তাদেরকে বিচ্যুত করতে পারবে না। পৃথিবীর কোনো পরিস্থিতি তাদেরকে আদর্শিকভাবে পরাজিত করতে পারবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সত্যের ওপর অটল থাকবে। যারা তাদেরকে সাহায্য করা ছেড়ে দেবে, তারা এই দলের কিছুই করতে পারবে না। এমনকি এভাবে আল্লাহর আদেশ তথা কিয়ামত এসে যাবে আর তারা যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকবে, অর্থাৎ অনুরূপ (সত্যের ওপর অটল) থাকবে।'[২২৮]

পরিতাপের বিষয় হলো, পরাজিত ও প্রভাবিত মানসিকতা নিয়ে একদল মুসলিম নিজেদের এই ধারার প্রতি অনাস্থাবোধ করছে। যুগের সাথে তাল মিলানোর জন্য তারা ইসলামের স্বীকৃত বিধানকে বিনষ্ট করে দীনের নব্য ব্যাখ্যা আবিষ্কার করছে।

হাদিসশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইসনাদ বা সনদ। সনদ বা ইসনাদ বলা হয়, কোনো বক্তব্য বা মতের উৎসমূল পর্যন্ত ধারাবাহিক সূত্রধারাকে। এই ইসনাদ ইসলামের প্রতিটি জ্ঞানশাস্ত্রের প্রধান শর্ত। সালাফদের থেকে খালাফদের কাছে তাহরিফ ও তাবদিল মুক্ত সুরক্ষিত দীন ইসনাদের মাধ্যমেই পৌঁছেছে। ইসনাদ এমনই এক বৈশিষ্ট্য, যেটি এই উম্মতকে ছাড়া অন্য কোনো উম্মতকে দেওয়া হয়নি। দীনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসনাদ ও তাওয়ারুসের গুরুত্ব অপরিসীম। শরিয়াহর ইলম ও ফাহম উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের ইসনাদ ও তাওয়ারুসের প্রতি সর্বোচ্চ লক্ষ রাখতে হবে। নতুবা এই দীন সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থিদের মিথ্যাচার ও মূর্খদের অপব্যাখ্যায় জর্জরিত হবে। এজন্যই আমাদের সালাফরা ইসনাদ ও পরম্পরা-সূত্রকে দীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে

---

২২৮. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৪৮৪৪

মোবারক রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইসনাদ হলো দীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি ইসনাদ না থাকত, তবে দীনে যে-কেউ যা ইচ্ছা বলে ফেলত।'[২২৯]

ইমাম আওযায়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইসনাদ চলে গেলে ইলমও চলে যাবে।'[২৩০] হাফেজ ইয়াজিদ বিন যুরাই রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'প্রত্যক দীনেরই একদল ঘোড়সওয়ার থাকে। এই দীনের ঘোড়সওয়ার হলেন আসহাবুল আসানিদ (সনদের অধিকারীগণ)।'[২৩১]

বর্তমান দীনি ও ইলমি অঙ্গনে আমরা যত ফিকরি বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামা দেখতে পাই, তার মূল সূত্র খুঁজতে গেলে আমরা দেখব দীনের ইলম ও বুঝের তাওয়ারুস ও সনদের অবহেলার কারণেই এই সমস্যা তৈরি হচ্ছে। যারা আজকে উম্মাহর স্বীকৃত মাজহাবকে শিরক ও বিদআত বলে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, তারাও সালাফে সালেহিনের ফাহম ও মানহাজকে উপেক্ষা করছে। হিজবুত তাওহিদের মতো দল যখন দাবি করে, দীর্ঘ তেরোশ বছর ইসলামের সঠিক বুঝ গোটা মুসলিম জগতে ছিল না, তাদের মাধ্যমে চৌদ্দশ পর আবার ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা ফিরে এসেছে, তখনো কিন্তু তারা মূল সমস্যাটা এই তাওয়ারুস ও সনদেই করছে। দীনের প্রজন্ম পরম্পরার চেইনকে (ধারা) তারা অস্বীকার করছে। আজকে মডার্নিস্টরা যখন পশ্চিমা সভ্যতার সাথে তাল মিলিয়ে ইসলামি শরিয়াহর বিভিন্ন আহকামের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা আবিষ্কার করার প্রয়াস চালাচ্ছে, তখনো কিন্তু তারা সালাফদের থেকে প্রাপ্ত দীনের মুতাওয়ারিস ফাহমকে প্রত্যাখ্যান করছে। যারা রাসুলের হাদিসের সুরক্ষা, প্রামাণ্যতা ও শরয়ি ক্ষমতাকে অস্বীকার করছে, তারাও সালাফদের মুতাওয়ারিস মানহাজকে প্রত্যাখ্যান করছে।

যে কাদিয়ানিরা ইসা আলাইহিস সালাম ও খলিফা মাহদিকে একই সত্তা দাবি করছে, ইসা আলাইহিস সালামকে জীবিত উঠিয়ে নেওয়ার ঘটনাকে অস্বীকার করছে এবং সবশেষে মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানিকে ইসা ও মাহদি পর্যন্ত দাবি করে বসছে, তাদের সমস্যাও দীনের মুতাওয়ারিস ফাহম ও আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করার কারণেই তৈরি হয়েছে। নিজেদের এই দাবির পেছনে তারা কুরআন-সুন্নাহর কিছু নসের এমন ব্যাখ্যাকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করছে,

---

২২৯. আল ইসনাদু মিনাদ দীন, পৃষ্ঠা ১৭

২৩০. আল ইসনাদু মিনাদ দীন, পৃষ্ঠা ২০

২৩১. প্রাগুক্ত।

যা সালাফে সালেহিন থেকে প্রমাণিত নয়। অনুরূপ শিয়াদের দিকে লক্ষ করলেও দেখা যাবে, তারা সালাফদের মুতাওয়ারিস ফাহম ও মানহাজকে অস্বীকার করছে। এমনকি স্বয়ং সালাফদের অনেক বড় বড় ব্যক্তিত্বদের কাফের বলছে, তাদের ওপর নোংরা অপবাদ দিচ্ছে, অকথ্য ভাষায় তাদের গালিগালাজ করছে। সুতরাং বলা যায়, এটি আধুনিক সময়ে মুসলিম উম্মাহর জ্ঞানতাত্ত্বিক মৌলিক একটি সমস্যা।

আমরা যদি উম্মাহর ভেতর ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে পড়া মৌলিক এই সমস্যাটিকে কমিয়ে আনতে পারি, আশা করি আমাদের ফিকরি ও ইলমি অনেক হাঙ্গামাই কমে যাবে। সাথে সাথে আমাদের মাঝে বৈধ ইখতিলাফের ব্যাপারে সহনশীলতা তৈরি হবে। আর হ্রাস পেতে থাকবে ইফতিরাক তথা অবৈধ মতবিরোধের মাত্রা। আমরা উপহার পাব বৈচিত্রময় ও ঐক্যবদ্ধ এক মুসলিম কমিউনিটি।

আমাদের মনে রাখতে হবে, ইসলামের পুরো জ্ঞান-কাঠামোর এক সক্রিয় ও শক্তিশালী সিলসিলা (সনদ) আছে। যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআলা এই দীনকে পরিচ্ছন্নভাবে আমাদের পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত নিয়ে যাবেন। এই সিলসিলা মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের হেদায়াতের জন্য তৈরি করে রেখেছেন। যেন যুগে যুগে মানুষ সত্যের সন্ধান পায় কোনো প্রকার পরিবর্তন ও বিকৃতি ছাড়াই। এখন আমরা যদি এই সিলসিলাকে সঠিকভাবে আঁকড়ে ধরি এবং এটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে সমৃদ্ধ করতে থাকি, তবে একই সাথে আমরা সত্য পথেও থাকতে পারব, আবার আগামী প্রজন্ম পর্যন্ত এই সিলসিলা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে একজন সৌভাগ্যবান সেবকও হতে পারব। আর যদি এই সিলসিলা প্রত্যাখ্যান করি, সেটা আংশিকভাবেই হোক কিংবা পূর্ণাঙ্গরূপে, নিশ্চিতভাবেই আমরা সঠিক ও হেদায়াতের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব এবং পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। দীন বোঝার ক্ষেত্রে ফাহমুস সালাফ হচ্ছে আমাদের জন্য কষ্টিপাথরস্বরূপ। আমাদের বুঝ যদি এই কষ্টিপাথরের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়, তবে আমরা এই বুঝ নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারব। সেই বুঝ পশ্চিমা চেতনার দৃষ্টিতে যতই কঠিন ও অযৌক্তিক মনে হোক।

মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সালাফে সালেহিন থেকে আসা মুতাওয়ারিস ইলমি ধারায় প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং সালাফে সালেহিনের মতো পবিত্র জীবন দান করুন। আমিন।

বইয়ে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ শব্দের অর্থ

নুসুস : কুরআন ও হাদিসের শাব্দিক বর্ণনা।

করনুন : শতাব্দি।

ইজতিহাদ : যে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায় না এবং যে বিষয়ে পূর্ববর্তী ইমাম ও ফকিহদের সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায় না, সে বিষয়ে দীনি বিধান বের করার জন্য শরয়ি নীতিমালার আলোকে যোগ্য ব্যক্তির গবেষণাকে ইজতিহাদ বলা হয়।

তাকলিফ : মুসলিমদের ওপর সুস্থসবল ও উপযুক্ত বয়সে শরয়ি বিধান পালনের যে দায়বদ্ধতা থাকে, তাকেই তাকলিফ বলা হয়।

তাদাব্বুর : চিন্তাভাবনা।

মাকাসিদে শরিয়াহ : শরিয়াহর উদ্দেশ্যসমূহ।

মাসলাহাত : আরবি শব্দ। এর বহুবচন হচ্ছে মাসালিহ। অর্থ : কল্যাণ।

ফন : শাস্ত্র।

জুমুদ : জড়তা, স্থবিরতা।

নাওয়াজেল : নব্য আপতিত বিষয় ও পরিস্থিতি।

মুখতালাফ ফিহি : যে বিষয়ে মতভিন্নতা রয়েছে।

মানহাজ : পদ্ধতি।

সিলসিলা : ক্রমধারা।

ইসনাদ : কোনো বক্তব্যের উৎস পর্যন্ত পৌঁছার সূত্রধারাকে ইসনাদ বা সনদ বলা হয়।

মানসুস আলাইহি : যে বিষয়ের ওপর নসের সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়, তাকে মানসুস আলাইহি বলে।

জাওয়াবেত : নিয়মাবলি।

ইসতিমবাত : গভীর অনুসন্ধানপূর্বক আবিষ্কার।

ইলহাদ : সত্য ও সঠিক পথ থেকে সরে যাওয়ার নাম ইলহাদ। এজন্য সমস্ত কুফর, শিরক ও দীনের বিকৃতি ইলহাদের অন্তর্ভুক্ত। বইটিতে ইলহাদ দ্বারা আমাদের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, দীনের এমন বিকৃতি, যা কুফরের সীমায় চলে যায়।

যানদাকা : যানদাকার কয়েকটি মর্ম আছে—

১. আল্লাহ ও আখিরাতে অবিশ্বাস করা।

২. ভেতরে কুফর গোপন রেখে বাহ্যিকভাবে ঈমান প্রকাশ করা তথা নিফাককেও যানদাকা বলা হয়।

আর এই ধরনের ব্যক্তিকে বলা হয় যিন্দিক।

মুতাজিলা : ইসলামি ইতিহাসের উমাইয়া আমলে জন্ম নেওয়া একটি ভ্রান্ত গোষ্ঠীর নাম। যারা ওহির ওপর আকলের মর্যাদা দেয়। তারা ঈমান ও কুফরের মাঝখানেও মানুষের আরেকটি অবস্থান দাবি করে। তারা মনে করে, বান্দার কর্ম বান্দার নিজেরই সৃষ্টি, এখানে আল্লাহর কোনো হস্তক্ষেপ নেই। তারা আল্লাহর সিফাতগুলো বাতিল সাব্যস্ত করে। তারা আরও মনে করে, কবিরা গুনাহকে আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন না। কবিরা গুনাহকারী নিশ্চিতভাবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে এবং সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল বিন আতা হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহর শিক্ষা মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে এই ফিরকাটিকে মুতাজিলা (বিচ্ছিন্ন) হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।

জাবরিয়া : জাবরিয়া ফিরকা বান্দার কর্মের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে। তারা দাবি করে, বান্দার সকল কর্ম যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, তাই বান্দার সকল কর্মই আল্লাহর কর্ম। এজন্য তারা বিশ্বাস করে, বান্দা কুফর করুক কিংবা শিরক, সকল কাজের দায়ভার আল্লাহর। বান্দা কোনো কর্মের জন্য বিচারের সম্মুখীন হবে না।

কাদরিয়া : কাদরিয়া বলা হয়, যারা মূলত কদরকে অস্বীকার করে। অর্থাৎ তারা মনে করে মানুষের কাজকর্মে আল্লাহর কোনো হস্তক্ষেপ নেই। মানুষ নিজেই তার কাজের স্রষ্টা। এরা জাবরিয়া সম্প্রদায়ের বিপরীত গোষ্ঠী।

খারেজি : খারেজি ইসলামি ইতিহাসে ভ্রান্ত একটি গোষ্ঠীর নাম। খারেজিদের মূল ভ্রান্তি হলো, তারা কবিরা গুনাহকারীকে কাফের মনে করে। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর জমানায় এই দলের উৎপত্তি হয়েছে।

রাফেজি : রাফেজি শিয়াদেরই আরেক নাম। যারা হজরত আবু বকর ও উমর রা.-এর খেলাফতকে অস্বীকার করে এবং আম্মাজান আয়েশা রা.-সহ অধিকাংশ সাহাবিদের গালমন্দ করে ও কাফের বলে। তারা মনে করে, আলি রা. ও তার বংশধররাই ছিলেন খেলাফতের একমাত্র হকদার ও উপযুক্ত। শায়খাইন তথা আবু বকর ও উমর রা.-এর খেলাফতকে অস্বীকার (রাফজ) করার কারণে এদেরকে রাফেজি বলা হয়। কারণ আরবিতে এর শাব্দিক অর্থ অস্বীকারকারী।

কাররামিয়া : কাররামিয়া গোষ্ঠীকে মুশাব্বিহাও বলা হয়। এই দলের মূল ভ্রান্ত বিশ্বাস হলো, তারা আল্লাহর গুণাবলিকে মানুষের গুণাবলির সদৃশ বলে দাবি করে।

জাহমিয়া : ইসলামি ইতিহাসে এরাও একটি ভ্রান্ত ফিরকা। এদের মূল ভ্রান্তি হলো, তারা মুশাব্বিহাদের বিপরীতে গিয়ে আল্লাহর সকল গুণাবলিকে অস্বীকার ও বাতিল করে দেয়।

ইখতিলাফ : গ্রহণযোগ্য দলিলের আলোকে ফুকাহায়ে কেরামের ভেতর শরিয়াতের শাখাগত বিষয় নিয়ে স্বীকৃত যে মতভিন্নতা তৈরি হয়, তাকেই ইখতিলাফ বলা হয়।

ইফতিরাক : যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য দলিল ব্যাতিরেকে নিছক খাহেশাত, শত্রুতা কিংবা অন্য কোনো মন্দ প্রবণতায় যে বিরোধ তৈরি হয়, সেটাই হলো ইফতিরাক তথা মুসলিমদের ভেতর ফাটল সৃষ্টি।

আম : আম শব্দের শাব্দিক অর্থ ব্যাপক। পারিভাষিকভাবে আম বলা হয়, যে শব্দটি কোনো প্রকার সংখ্যা, ধরন ও অবস্থার সীমাবদ্ধতা ছাড়াই অনেক সংখ্যক সদস্যকে শামিল করে নেয়।

খাস : খাস শব্দের শাব্দিক অর্থ নির্দিষ্ট। পারিভাষিকভাবে খাস বলা হয়, যে শব্দটি এককভাবে নির্দিষ্ট ধরন, নির্দিষ্ট অবস্থা ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যকে বুঝিয়ে থাকে।

মুতলাক : মুতলাক শব্দের শাব্দিক অর্থ মুক্ত, শর্তহীন। পারিভাষিকভাবে মুতলাক হলো, যা কোনো প্রকার শর্ত ছাড়াই সাধারণভাবে কোনো কিছুকে বোঝায়।

প্রকাশিত বই

বই : আধুনিক প্রাচ্যবাদের কবলে মুসলিম নারীসমাজ
লেখক : হাসসান বিন সাবিত

প্রকাশিতব্য বইসমূহ

বই : সালিহাত : ইসলামের আলোকে নারীর সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য
মূল : সারা হিশাম, মুনিরা আদিল, মাহা আবদুল লতিফ, আসমা বাসসাম, ফাতেমা সামি
অনুবাদ : মাওলানা জমির মাসরুর

বই : সংশয়বাদী তরুণী : নারীবিষয়ক হাদিস ব্যাখ্যায় বিপত্তির সূচনা যেখানে
অনুবাদ : কায়েস শরীফ

বই : ডিপ্রেশন
অনুবাদ : সাজ্জাদ হুসাইন

বই : মুসলিম নারী ও আধুনিক সাজসজ্জা
লেখক : হাসসান বিন সাবিত

বই : সংশয়পথ
লেখক : ইফতেখার সিফাত

লেখক সম্পর্কে

বর্তমানের পৃথিবীতে বসে যারা আগামীর স্বপ্ন দেখেন, মাওলানা ইফতেখার সিফাত হলেন তেমনই একজন ব্যক্তিত্ব। তার চিন্তাশক্তি ও চিন্তাসূত্র থেকে যে ক্রিটিকস ও সমাধান উদ্‌গত হয়, তা মেঘের আড়ালের রোদ্দুর হয়ে দীর্ঘসময় আলো ছড়ানোর শক্তি রাখে। সাধারণত এ ধরনের মানুষেরা গম্ভীর ও জটিল ভাষায় লেখালিখি করেন। মুহতারাম ইফতেখার সিফাতের স্বাতন্ত্র্য এই জায়গাটিতেই। তিনি জটিল ও শাস্ত্রীয় বিষয়কে ফুটিয়ে তোলেন 'জনমানুষের ভাষায়'। যে ভাষায় মানুষ কথা বলে ও মনের ভাব প্রকাশ করে। এর ফলে তার লেখা থেকে 'মুক্তো তুলে মালা গাঁথা' একেবারেই সহজ।

তিনি মূলত সামসময়িক মুসলিমদের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি নিয়ে কাজ করেন। বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই ও চেতনার আগ্রাসনের ফলে আমাদের ওপর যে পারতন্ত্র্য চেপে বসেছে, তার স্বরূপ উদ্ঘাটন ও শরিয়াহভিত্তিক সমাধান পাওয়া যায় তার লেখায়। তার প্রশংসনীয় একটি দিক হলো, তিনি চলতে ভালোবাসেন কুরআনের মাইলস্টোন দেখে, ভাবতে ভালোবাসেন হাদিসের সীমানায় থেকে এবং বলতে ভালোবাসেন সালাফের ফাহমে সজ্জিত হয়ে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই তার লেখা মার্জিত এবং বোদ্ধামহলে গৃহীত।

তিনি পড়াশোনা করেছেন কওমি মাদরাসায়। একাডেমিক পড়াশোনা শেষ করে এখন তিনি ব্যস্ত লেখালিখি নিয়ে। তার প্রধান কাজ হলো তাফাক্কুর ও লেখালিখি। ইতোমধ্যেই তার বেশ কিছু বই বাজারে এসেছে। *হিউম্যান বিয়িং* লেখকের প্রথম মৌলিক গ্রন্থ। মৌলিকের পাশাপাশি তার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের অনুবাদ ও সম্পাদনাকর্ম রয়েছে। তার অনূদিত গ্রন্থগুলো হলো, *ইতিহাসের আয়নায় বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা, ইসলামী ব্যাংক : ভুল প্রশ্নের ভুল উত্তর, তাদাব্বুরে কুরআন, নববি কাফেলা ও সায়িদাত*। *ফাহমুস সালাফ* লেখকের দ্বিতীয় মৌলিক গ্রন্থ।

তার চিন্তা ও প্রয়াসে যে গতি ও স্বচ্ছতা রয়েছে, তা একটি প্রজন্মের রাহবার হয়ে উঠুক। এ দেশে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ক্ষেত্র তার হাত ধরে এগিয়ে যাক। এ-ই কামনা।

মাওলানা সাজ্জাদ হুসাইন
লেখক। অনুবাদক

ইসলামকে বিকৃত করে পশ্চিমা সভ্যতা ও মতাদর্শগুলোর সাথে সামঞ্জস্যশীল করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো সালাফে সালেহিনের মুতাওয়ারিস ফাহম। এজন্য পশ্চিমের প্রাচ্যবাদী বিভিন্ন সংস্থাও সালাফে সালেহিনের ফাহমের তিরস্কার করেছে। দীনের এই মুতাওয়ারিস ফাহম ও ইলমকে জড়, আবদ্ধ, পুরোনো, কট্টর ইত্যাদি শব্দে আখ্যায়িত করেছে। তা ছাড়া আমরা দেখব, সমস্ত ভ্রান্ত ফিরকাসহ পশ্চিমা সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত মডার্নিস্ট স্কলার ও মুসলিম দীনের মুতাওয়ারিস ফাহম ও মানহাজের তোয়াক্কা করে না; বরং তারা বিভিন্ন স্লোগান ও ভ্রান্ত যুক্তির আড়ালে মুতাওয়ারিস এই ধারাকে প্রশ্নবিদ্ধ ও গুরুত্বহীন করার অপপ্রয়াস করছে। ফলে আধুনিক সময়ে সালাফে সালেহিন থেকে প্রাপ্ত মুতাওয়ারিস ফাহম ও মানহাজের ওপর যত প্রকার আঘাত আসছে এবং বিষয়টি কেন্দ্র করে যত প্রকার নৈরাজ্য চালানো হচ্ছে, সেগুলো দমন করার জন্য বিষয়টি উম্মাহর সামনে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা জরুরি। সে লক্ষ্যেই আমাদের এই পরিবেশনা।